উপন্যাস সিরিজের সপ্তম সংখ্যা

পরশমণি

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।

১লা চৈত্র, ১৩২৬।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

উপহার
তারিখ
শ্রী
সতীশ
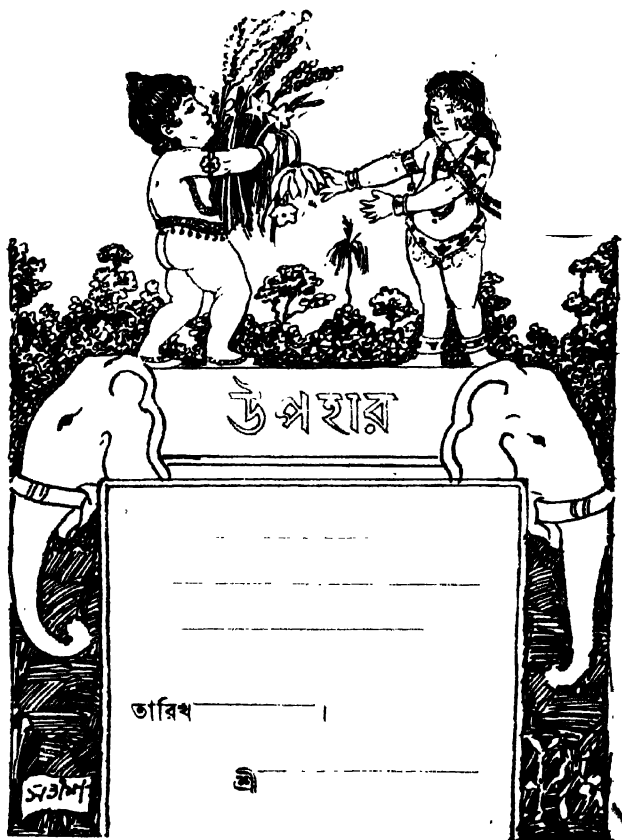
পরশমণি।

এক

খুব তর্ক চলিতেছিল। মেসের বাসা। পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের মোড়ে একটী ক্ষুদ্র ত্রিতল বাটী। এই বাসাটির সহিত সাধারণ মেসের বাসার একটু প্রভেদ আছে। এ বাসার মালিক কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় রূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তীরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। সকলেই এম্, এ পাশ করিয়া আইন অধ্যয়নে রত। বিমল, সুরেন, বিজয়, মন্মথ ও চারু, এই পঞ্চ মহারথী মিলিয়া মিশিয়া এই বাসায় ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিতেছিল। বিজয় ও সুরেনের বাড়ী ঢাকা জেলায়, মন্মথ, চারু ও বিমলের বাড়ী নদীয়া। এই পাঁচবন্ধু কলেজ জীবনে এক সঙ্গে, এক বাসায় বরাবর থাকিয়া লেখাপড়া করিয়া এখন সংসারে প্রবেশের সীমান্ত ভাগে আসিয়াও কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে নাই। চাকর শম্ভুরাম ও মেদিনীপুর জেলার গোবর্দ্ধন ঠাকুর এই পাঁচবাবুর মন যোগাইয়া আসিতেছে। বহুদিনের বিশ্বস্ত ঠাকুর ও চাকরের উপর মেসের এই ক্ষুদ্র সংসারের

ভারটা চাপাইয়া দিয়া ইহারা নিশ্চিন্ত মনে আপনাদের ছাত্র-জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যরীতি ঠিক্ কলের গাড়ীর মত চালাইয়া যাইতেছিল। ভোরের বেলা কলেজে কোন রকমে হাজিরা টুকু দিয়া সারা দ্বিপ্রহর গল্প গুজব, সাহিত্য-চর্চ্চা, মাঝে মাঝে বা আইনের পুঁথির দুই এক পাতা উল্‌টাইয়াই ইহারা কোনরূপে সময়টা কাটাইয়া দিত।

ফাল্গুনের সন্ধ্যা। সারা কলিকাতা সহরটাকে প্রখর তাপে দগ্ধ করিয়া সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে কোন এক তেলের কলের বড় চিমনীর পশ্চাতে লুকাইয়া গিয়াছেন। গরম পড়িয়াছে, রাস্তা দিয়া বেলফুলের মালা হাঁকিয়া যাইতেছে, কুল্পীবরফওয়ালা জাঁক করিয়া ডাকিতেছে। গলিতে সবেমাত্র গ্যাসের বাতিগুলি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে।

খোলা ছাতে পাঁচখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া বন্ধু পাঁচজন তর্ক করিতেছিল। সকলের সম্মুখে ছোট ছোট বেতের টিপয়ের উপরে চায়ের পেয়ালা, পেয়ালাগুলি হইতে ধুঁয়া উঠিতেছিল! কেহবা এক এক চুমুক চা পান করিয়া আরামসূচক আঃ আঃ ধ্বনি করিতেছিল।

সেদিন রবিবাবুর কবিতা বাঙ্গালীকে কতদূর স্ত্রী-স্বভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে আর দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদিকে কতদূর পুরুষ গড়িয়াছেন তাহা লইয়া তর্ক বাঁধিয়াছিল। খুব জোরেই তর্ক চলিতেছিল। বিমল বলিতেছিল "সুরেন দা! আপনি যাই বলুন না কেন, রবিবাবুর মত বড় কবি আমাদের দেশে জন্মেছে বলে

আমাদের গৌরব করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই একজনকে ;নিয়ে আমরা বিশ্বসাহিত্যের সমক্ষে দাঁড়া'তে পারি।"

সুরেন খুব চটিয়া গিয়াছিল, সে সুর চড়াইয়া বলিল "তুই কি বুঝ্‌বি বিমল। তুই সেদিনকার ছেলে বইত নস্" (যদিও তাহাদের বয়সের দুই এক বৎসরের বেশী পার্থক্য ছিলনা) রবিবাবু আবার কবি! কিরে চারু সেই গানটা?

'আমি নিশি দিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও।'

এসব গান, এসকলের সুর, এসব মেয়েলি ভাব আমাদের দেশে সাজে না। আমরা একেত দুর্ব্বল, তায় মেয়েলি স্বভাব, তার উপর এমন কবিদের কবিতার প্রচলন হলেই হয়েছে আর কি? আর দেখ দ্বিজু রায়ের গান, আমাদের ন্যায় অলস নির্জীব প্রাণের ভেতরেও একটা শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করে দেয়। এইত কবি! এইত মানুষ! একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন ঘাড় বাঁকাইয়া গান ধরিল—

'দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ!'

বিমল ও মন্মথ গর্জ্জিয়া বলিল "রেখে দাও তোমার দ্বিজু বাবুর কবিতা? রবিবাবুর সঙ্গে তার তুলনা? রবিবাবুর ছেলেবেলাকার একটা গানের কথা মনে করে দেখ্ দেখি, কি সুন্দর ভাব! কি সুন্দর রচনা!—"

'একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্ !
মুখ তুলে আজি চাহরে !"

আর রবিবাবুর—'অয়ি ভুবনমনমোহিনীর' তুলনা কি কোথাও হয়রে ?"

চারু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিল, "তোমরা বাজে বকা ছেড়ে দাও। রবিবাবু বড় কি দ্বিজু বাবু বড় সে তর্ক দিয়ে আমাদের লাভ কি ? সময়ই এর বিচার করবে ? তবে কি জান ভাই আমাদের দেশের কবিদের বড় দুর্ভাগ্য, ভক্তের দলেরা তাঁদের বইগুলো না পড়েই খুব বীর দর্পে তর্ক চালাতে সুরু করেন। এতে লাভ কি ? আমরা বাস্তবিক বড়ই হুজুগপ্রিয় জা'ত। তোমরা এখন হুজুগ ছাড়।"

সুরেন বলিল—"ঠিক্ বলেছিস্ চারু। তোর কথাগুলো আমার মনের মত। তর্ক করে লাভ কি ? মাঝ থেকে গলাভাঙা, আর ক্ষিধে বৃদ্ধি করা। ওরে শম্ভু ! আর পাঁচ পেয়ালা চা নিয়ে আয় বাবা !"

তর্কটা যেমন সহসা জমিয়া উঠিয়াছিল নিবিয়াও গেল তেমনি সহসা। মেসে সাহিত্য বল, সমাজ বল, থিয়েটার বল, কোন বিষয়ের তর্কই বাদ যায় না। আর ছাত্র-জীবনে সকলেরই মনে মনে নিজেদের খুব বড় সাহিত্যিক, সমালোচক ও বিজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। 'তর্ক

বাঁধিলে গোল যে পরিমাণ বাঁধে, মীমাংসা সে পরিমাণে হয় না। অনেক সময় কোন তৃতীয় ব্যক্তি তর্কের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়াই উঠিতে পারেন না। যেখানে সকলেই স্বাধীন, সকলেই সমশিক্ষিত, সেখানে তর্কের মাত্রাটা যে মাঝে মাঝে কতদূর ছাড়াইয়া উঠে সে কথাটা না বলিলেও চলে।

তর্ক থামিলে বন্ধুদলে নানাকথা আরম্ভ হইল! বিজয় কয়েক দিন যাবত একটু বিষণ্ণ, বন্ধুদের তর্ক-বিতর্কে তেমন করিয়া যোগ দিত না, আজিকার তর্কেও সে যোগ দেয় নাই। নীরবে একপাশে বসিয়া তর্ক শুনিতেছিল। ইহারা পাঁচবন্ধু আমোদে প্রমোদে সুখে দুঃখে কোন বিষয়ই কেহ কাহারও নিকট কোন কথা গোপন না করিলেও বিজয়ের বর্ত্তমান অশান্তির কথা সে কাহাকেও বলে নাই।

আজ তিন বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে, কই সে ত কমলার নিকট হইতে একখানা পত্রও পাইল না! চিঠি লিখিয়াছে তবু উত্তর নাই, কেন? সে দরিদ্র, আর কমলা বড় লোকের মেয়ে বলিয়াই কি এই পার্থক্য? তাই বা হইবে কেন? তাহা হইলে নিয়মিত পড়ার খরচই বা আসিবে কেন? মেসের অন্যান্য সকলের চেয়ে চারুর সহিতই তাহার একটু বেশী ভাব। চারু যখন তাহার পত্নীর এসেন্সমণ্ডিত গোলাপী রঙের কাগজে মোটা মোটা অক্ষরের, লেখা পত্রগুলি বিজয়কে দেখাইত, তখন বিজয়ের মনে এক অতৃপ্তির বেদনা ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

পরশমণি

মেসের সকলেই বিবাহিত। মন্মথ, চারু, বিমল, সুরেন্ সকলেই বড় লোকের ছেলে, কাহারো বাপ ডেপুটী, কেহ উকীল, কেহবা মুন্সেফ। ইহাদের মধ্যে বিজয়ই দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান, পিতা রামনিধি ন্যায়পঞ্চাননের দেশে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যত বেশী ছিল, অর্থাগম সে পরিমাণে ছিল না। অর্থের জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের তেমন আগ্রহও দেখা যাইত না। কোনরূপে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন কাটাইয়া তিনি পরমানন্দ অনুভব করিতেন। সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র বিজয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায়ই সে বৃত্তি লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। বি, এ পরীক্ষার পরে বিজয়ের সহিত শ্যামনগরের জমিদার রাধাকান্ত চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার বিবাহ হইয়াছে। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে সুপাত্র পাওয়া বড় সহজ নহে, তাই গর্ব্বিত ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী নিরুপায় হইয়া দরিদ্র ন্যায়-পঞ্চাননের পুত্রের সহিত স্বীয় প্রিয়তমা দুহিতার বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় নিরিবিলপটির শ্রেষ্ঠ কুলীন, তাহার ঘরে কন্যাদান করা কৌলীন্যত্ব বা সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে গৌরবজনক মনে হইলেও জমিদার মহাশয় নিজে ততটা গৌরবান্বিত মনে করেন নাই, বরং দরিদ্র ন্যায়পঞ্চাননের পুত্রের তাহার ন্যায় ধনশালী, প্রতাপান্বিত জমিদারের কন্যা বিবাহ করা যে একান্ত সৌভা-গ্যের কারণ হইয়াছে, তিনি সেই দাম্ভিকতাপূর্ণ হৃদয়েই আত্মতৃপ্তি

অনুভব করিতেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় অর্থে দরিদ্র হইলেও হৃদয়ে দরিদ্র ছিলেন না, তিনি বিবাহে কোন পণ গ্রহণ করা দূরে থাকুক এমন কি ছেলের পড়ার খরচের দাবিও তিনি করেন নাই। শশুর জমিদার মহাশয় পড়ার খরচ বাবদ যে টাকাটা পাঠাইতেন তাহার জন্য পিতা বা পুত্র কোন দিন প্রার্থনা করেন নাই, উহা জামাতার প্রতি স্নেহ বা কর্ত্তব্যের অনুরোধ, এ দু'টীর কোন একটী হইতেই রাধাকান্ত বাবু বিজয়কে প্রতি মাসান্তে নিরূপিত ত্রিশ মুদ্রা সাহায্য প্রেরণ করিতেন।

ঝড়ের পরে প্রকৃতি যেমন শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি বন্ধুদলের তর্ক শেষে, খোলা ছাতখানি স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। তখন তাহাদের মধ্যে কেহ সিগার ধরাইয়া, কেহবা আকাশের পরিস্ফুট জ্যোৎস্নার দিকে তাকাইয়া কেহবা তখনও দ্বিতীয়বারের দেওয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া আরাম অনুভব করিতেছিল। এমন সময় সদর দরজায় কড়া কড়, কড়া কড়্, রবে কড়া নড়িয়া উঠিল। শম্ভু তাড়াতাড়ি নীচে ছুটিয়া গেল এবং খানিক পরে একখানা টেলিগ্রাম আনিয়া বিজয়ের হাতে অর্পন করিল। তাড়াতাড়ি সহি দিয়া টেলীগ্রামখানা লইয়া পাঠ করিয়া সে একেবারে বসিয়া পড়িল। তাহার হাত হইতে টেলীগ্রামখানা পড়িয়া গেল। সকলে একসঙ্গে সহানুভূতির করুণস্বরে বলিয়া উঠিল 'কিরে কি খবর?' বিজয় বলিল, "বাবা বাঁচেন কিনা সন্দেহ, আমাকে দেখতে চাইছেন,

কি করব ভাই ?"—বলিতে বলিতে তাহার নয়ন বহিয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল।

চারু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, "তাইত, বড় খারাপ খবর। শম্ভু তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে ঠাই কর্‌তে বল্‌।"

বিজয় শিশুর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না ভাই আমি কিছু খাবনা! দেখ ত গাড়ী পাব কি না ?"

"সবে নয়টা, গোয়ালন্দ মেল সাড়ে দশটায় ছাড়ে, তুই গুছিয়ে নে না ? আর বাড়ী পৌঁছতেই যে দু'দিন লাগবে। একি না খেয়ে যাওয়া চলে ?" বন্ধুগণ তখনি উঠিয়া পড়িল, কেহ বিজয়ের জন্য গাড়ী আনিতে ছুটিল, কেহ বা তাহার জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিল, কেহ তাহার খাওয়ার কাছে বসিয়া স্নেহময়ী জননীর মত "এটি খাও ওটি খাও" বলিয়া খাওয়ার সুব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিল। বিজয়ের কিন্তু কিছুই খাওয়া হইল না।

সে রাত্রিতে বিজয়কে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া বন্ধুগণ বিশেষ অশান্তি বোধ করিতে লাগিল। বিজয়কে বাড়ী যাইয়াই তাহার পিতার কুশল সংবাদ জানাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া দিয়াছিল। আর বিজয়! সে পিতার ভাবি বিপদাশঙ্কায় শঙ্কিত চিত্তে সারা পথ কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।

দুই

সে দিন মেঘমুক্ত গগনে সহসা গিরি-সম্রাট কাঞ্চনজঙ্ঘা আপনার মহিমময় বিরাট মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক দিন যাবত দার্জ্জিলিংএ খুব বাদ্‌লা গিয়াছে—কুয়াসার ঘন আস্তরণে, বৃষ্টির অবিরাম বর্ষণে অধিবাসীরা অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাই সেদিন ভোরের বেলা মেঘ কাটিয়া গেলে, প্রভাত তপনের অরুণ-কিরণ প্রভা-রঞ্জিত অনন্ত নীল গগণ পটে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল তুষারাবৃত বিরাট মূর্ত্তি যখন স্বর্ণ-কিরীট শোভায় সুশোভীত হইয়া অনিন্দ্যরূপ মাধুর্য্যে বিকশিত হইয়া বিশ্ব-পতির সৃষ্টি-কৌশলের এক মহিময় কল্পনাতীত চিত্র মেঘে যবনিকার ঘন অন্তরাল হইতে সহসা উন্মুক্ত করিয়া দিল, সেদিন দার্জ্জিলিং ভ্রমণ-কারীরা কিযে এক অপূর্ব্ব মানসিক আনন্দানুভব করিয়াছিলেন তাহা-যাহারা দার্জ্জিলিং বেড়াইতে যাইয়া সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন লাভ করিয়া দার্জ্জিলিং ভ্রমণের সার্থকতা অনুভব করেন—তাহারাই প্রকৃত ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন।

কমলা সেদিন খুব ভোরে উঠিয়াছিল—সে সচরাচর অত প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে না। একপক্ষকাল দার্জ্জিলিং আসিয়াও কাঞ্চন-জঙ্ঘার দর্শন-সুখলাভ করিতে না পারায় সে মনে মনে একটা অশান্তি বোধ করিতেছিল। আজ সহসা ভোরে উঠিয়া উত্তর দিকে চাহিয়া

যখন সুবর্ণ কিরীট শোভিত গিরি সম্রাটকে স্বীয় মহিমময় সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখিতে পাইল, তখন তাহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। সে আনন্দে চীৎকার করিয়া বাড়া শুদ্ধ একটা হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিল—এই দৃশ্য সে একা দেখিয়া প্রাণে শান্তি বোধ করিতেছিল না—আপনার বলিতে যাহারা সেখানে ছিল তাহাদের সকলকে দেখাইয়া তবে সে প্রাণে একটা অখণ্ড শান্তি অনুভব করিল।

শৈলেশ বলিল—"দিদি! চলনা বার্চ্চহীল গিয়ে ভাল ক'রে দেখে আসি।" ইন্দিরা বলিয়া উঠিল, "সত্যি দিদি! চলনা!" কমলা শিরোন্দলনে সম্মতি জানাইয়া তিনজনে ভ্রমণে বাহির হইল।

রাধাকান্ত বাবু তখনও গাত্রোত্থান করেন নাই। আর অত ভোরে ওঠাও তাহার অভ্যাস নাই। এখানকার দৃশ্যাবলী বা কাঞ্চনজঙ্ঘার এই সৌন্দর্য্য দর্শন বহুবার তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। দার্জ্জিলিংএর এইরূপ শীতের ভিতর ঘুরিয়া আসিলে তাহার বাতের পীড়ার বৃদ্ধি হওয়ারই সম্ভাবনা; ডাক্তারদের এই উপদেশটা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে কোনদিন বিস্মৃত হন নাই। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা নিজের খেয়ালটিকে বজায় রাখিয়াই চিরদিন সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাহে, রাধাকান্ত বাবুও সেই শ্রেণীর লোক। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহার বিরুদ্ধে শত বিজ্ঞ জনের সহস্র বাধাও কোনওরূপে তাহাকে গতিপথ হইতে ফিরাইতে পারিত না।

রাধাকান্ত বাবু লক্ষপতি ভূম্যধিকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি লাভ করিবার সৌভাগ্য তাহার অদৃষ্টে না হইলেও শৈশবে ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হওয়ায়, উচ্চশিক্ষার কোন অভাবই তাঁহাতে ছিল না। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার ন্যায় পটুতা অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যাইত। শৈশব হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকিয়া ইংরেজী আদব-কায়দা তাহার অস্থি-মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা, আহার-পদ্ধতি, সমুদয়ই নবীন সমাজের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। মেয়ে দুইটীকেও সেই-ভাবেই শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। গৃহে মেম শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া সভ্য সমাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। দুই বৎসর হইল পুত্র শচীন্দ্রনাথ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত গমন করিয়াছে, এখন অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করিতেছে। সভ্য দেশগুলির হাওয়ায় তাহার জীবনটীকে সে পূর্ণভাবে গঠিত করিয়া তোলে, ইহাই রাধাকান্ত বাবুর একান্ত আগ্রহ।

মেয়েদের শিক্ষিত করিলেও বিবাহ সম্পর্কে স্বীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ রত্ন সংগ্রহের জন্য তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নাই। রামনিধি ন্যায়পঞ্চাননের সুশিক্ষিত সুদর্শন পুত্রটিকে জামাতা রূপে যত সহজে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইন্দিরার স্বামী শৈলেশকে তিনি তত সহজে পান নাই।

শৈলেশের পিতা দীর্ঘকাল পুলিশে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক শান্তিতে নিজ বাস-পল্লীতে দিনগুলি অতিবাহিত করিতে, ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে শৈলেশ এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় কোনও বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিতে ছিল। সে কলেজ-জীবন হইতেই সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে। সেবার স্নেহলতার মৃত্যুতে সমুদয় সংবাদপত্র যখন তাহার ঘটনাবলম্বন করিয়া বর-পণের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, তখন গোলদীঘির এক বক্তৃতামণ্ডপে সে অন্যান্য সহপাঠিগণের সহিত নিজ বিবাহে কোনরূপ পণ গ্রহণ করিবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে যখন দশ হাজার টাকা মূল্য দানে রাধাকান্ত বাবু তাহার কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দিরার জন্য তাহাকে ক্রয় করিয়া লইলেন, তখন সে প্রতিজ্ঞার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল।

কমলা, ইন্দিরা ও শৈলেশ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে। রাধাকান্ত বাবু সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে গরম কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া ড্রইং রুমে আসিয়া বসিয়াছেন। গড়গড়ার ধূমপানে তাঁহার প্রাণে সরসতা জাগিয়াছে। কমলা ও ইন্দিরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পিতার নিকট তাহাদের ভ্রমণের সার্থকতা জ্ঞাপন করিল। তিনি কোন কথা বলিলেন না, নীরবে শুনিয়া গেলেন। রাধাকান্ত বাবুর মেজাজ যখন খুব ভাল থাকিত তখন

বেশী কথা না বলাই তাহার অভ্যাস ছিল, গড়গড়ার নলের প্রতি তখন তাঁহার সমধিক প্রীতি দেখা যাইত।

কমলা ও ইন্দিরা বিশ্রাম-কক্ষে গমন করিলে, শৈলেশ ও তাহাদের অনুগমন করিল। এমন সময়ে ধীরে ধীরে রাধাকান্ত বাবুর স্ত্রী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী তারাসুন্দরী রুগ্না ও শীর্ণা, তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যই রাধাকান্ত বাবু সপরিবারে দার্জ্জিলিং আগমন করিয়াছেন। একসময়ে তারাসুন্দরী যে রূপবতী রমণী ছিলেন এ প্রৌঢ় বয়সেও যৌবনের সেই দীপ্ত সৌন্দর্য্যের ছাপ তাহার মুখে লাগিয়া আছে।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "কমলকেত একবার নন্দনপুর না পাঠালে চলে না।" রাধাকান্ত বাবু মুখ হইতে গড়গড়ার নল নামাইয়া বলিলেন 'কেন ?'

"আজ এইমাত্র বিজয়ের পত্র পাইলাম, "বেয়াই বাঁচেন কি না সন্দেহ। এবারে না পাঠানো ত ঠিক্ হয় না।" রাধাকান্ত বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "গিয়ে কোথায় থাকবে ?"

"কেন তারা যেখানে থাকে সেইখানেই থাকবে, মেয়ের বিয়ে হয়েছে ঘর করতে হবে ত ? এই তিন বছর বিয়ে হয়েছে—মাত্র দু'দিন সেখানে ছিল, তারপর বেয়াই মশাই কতবার চিঠি লিখলেন, জবাব খানাও দিলে না—একাজগুলো কি ভাল হয়েছে ?"

"ভালমন্দ সে আমি জানি। আজ শরীর কেমন? মাথা ধরাটা সেরেছে ত?"

রাধাকান্ত বাবু পত্নীর স্বভাবটি বেশ বুঝিতেন। পীড়ার কথা উত্থাপন করিলেই তাঁহার আর কোন কথা মনে থাকিত না। তারাসুন্দরী স্বামীর কথায় যন্ত্রণা-সূচক ধ্বনি করিতে করিতে বলিলেন "সেরেছে আর কোথায়? তাইত কমল চলে গেলে কেই বা আমায় দেখবে? ইন্দিরাও ছেলেমানুষ, আর হাজার ঝি চাকর বল, তার মত শুশ্রূষা কেউ করতে পারে না। তবে বলছিলুম কি, বিজয় কি মনে করবে? হাজার হলেও মেয়ের বিয়ে হলেই সে পর হয়, তাই বলছি কমলকে পাঠিয়ে দাও।"

রাধাকান্ত বাবু বলিলেন, "আমি আমার মেয়েকে আস্তাকুঁড় ঝাট দেওয়ার জন্য অজ পাড়াগাঁয়ে কখনো পাঠাব না। মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বেশ হয়েছে। যদি বিজয় আমার এখানে এসে থাকে ভাল, নইলে শুন্‌ছো আমি আমার মেয়েকে কখনো অমন গরীবের ঘরে দাসী বাঁদীর মত খাটতে পাঠাব না। ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের যে ভাবে গড়েছি, সারা জীবন তারা সেভাবে কাটাতে পারে, সে ব্যবস্থাও আমি করবো।"

"আচ্ছা কমলকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না?"

'বেশ!' গৃহিনী কমলকে ডাকিতে যাইয়া দেখিলেন সে শয্যায় তনুলতা এলাইয়া দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। শৈলেশ ও

ইন্দিরা চোখে মুখে গোলাপ জল ও অডিকলোনের ঝাপ্টা দিতেছে। কন্যাকে এইরূপ আকস্মিক মূর্চ্ছাক্রান্ত দেখিতে পাইয়া গৃহিণীর আর কোন কথা বলা হইল না।

দুইদিন পরে বিজয় সংবাদ পাইল; কমলা পীড়িতা তাহার যাওয়া অসম্ভব।

তিন

প্রভাত হইতে সারাদিন ভৈরব-গর্জ্জনে ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে ষ্টীমার যখন রাজঘাট ষ্টেশনে থামিল, তখন দিনান্তের রক্তরবি পদ্মার বিশাল বক্ষে শেষ রশ্মি ছড়াইয়া দিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। নদীর অপর তীরে দিগন্তলীন গ্রাম্যতরু-শ্রেণী মসীরেখার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। পদ্মার বিরাট বক্ষ দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ—নিস্তরঙ্গ। বিশালত্ব কোথাও এত বেশী যে সেখানে সমূদ্রের ন্যায় পার দেখা যায় না, শুধু রজতবৎ তরল সলিল রাশি আপনার বেগে বহিয়া চলিয়াছে। মাঝে দুই একটী বড় চর, বিস্তৃত বালুকাকীর্ণ, উহার দুই একস্থানে রোয়াধানের চারাগুলি মাথা গজাইয়া উঠিয়াছে। মাচা বাঁধা খড়ের ঘর, কোনও জমিদারের দখল স্বত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। তীরের সবুজ সুন্দর শস্যক্ষেত্রের মনোরম দৃশ্য, গ্রাম্যবধূগণ দলে দলে কলসী কক্ষে জল লইতে আসিতেছে ও যাইতেছে, তাহাদের চকিত চঞ্চল দৃষ্টি, কেহবা হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত

কাপড় গুটাইয়া লইয়া জল ভরিতে নামিয়াছে কিন্তু জাহাজের ঢেউয়ে কলসী ও আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া তীরের দিকে দ্রুত ফিরিয়া চলিয়াছে।

সারাদিনের উপবাসে ক্ষিন্ন, চিন্তাকুল বিজয় ট্রাঙ্কটি লইয়া মন্থর গমনে এক ডিঙ্গি নৌকার মাঝির আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজঘাট হইতে নন্দনপুর দুই ক্রোশ। গ্রামখানি পদ্মার একটী ক্ষুদ্রকায়া শাখা নদীর তীরে অবস্থিত। নৌকা চলিল। তখন আকাশে ভরা জ্যোৎস্না—দুই একখানা সাদা মেঘ অতিথির মত গগনের এদিকে ওদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। খোলা মাঠে শস্যসম্ভার জ্যোৎস্নালোকে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করিয়া দিয়াছে। নদী বক্ষে মাল বোঝাই নৌকাগুলি শুভ্র পাল উড়াইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। আকাশেও ভরা জ্যোৎস্না নদীর বুকেও ভরা জোয়ার। কি সুন্দর দৃশ্য! ছল ছল কল কল রবে নৌকাখানি দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। মাঝি আপন মনে বৈঠা খানাকে দ্রুত সঞ্চালন করিতে করিতে ভাটিয়ালী সুরে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

"ও পরাণ কানাইও! দারুণ বছরের কালে
নারীর পতি বৈদেশ গেলে
নারীর পরাণ বাইরম্ বাইরম্ করে
ও প্রাণ কানাইও!"

শৈশব হইতে শোকের আঘাত সহিতে সহিতে বিজয়ের প্রাণে কেমন একটা অবসাদ জাগিয়াছিল। চারি বৎসর বয়সে স্নেহময়ী জননীর স্নেহাঞ্চল বিচ্যুত হইয়া, দেবতুল্য তেজস্বী পিতার স্নেহ-নীড়ে এতদিন সে যত্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে, মাতৃহীন সে, মাতার বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করে নাই, একাধারে পিতা ও মাতার ন্যায় স্নেহশীল আশ্রয়-তরুকে আজ কিনা মৃত্যু তাহার নির্মম নিষ্ঠুর দণ্ড প্রহারে ভূমিস্মাৎ করিয়া ফেলিতে চাহে! এই কি বিধাতার বিচার! এই কি সেই বিশ্বনিয়ন্তার ন্যায়নিষ্ঠ নীতি?

গ্রামের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল, তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। নদীর তীর হইতে অল্প দূরেই ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়ের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে বাগান, বাগানের উচ্চ সুপারি ও নারিকেল গাছ হইতে সর্ সর্ শব্দ হইতেছিল। কম্পিত হৃদয়ে শঙ্কিত পদে ধীরে ধীরে বিজয় বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের প্রবল ব্যাকুল স্পন্দন রব শুনিতে পাইতেছিল। বুঝি বাবা আর বাঁচিয়া নাই। একথা মনে হইতেই তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া শোণিতরাশি নয়নযুগলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। পা চলে না, তবু অগ্রসর হইতেছে। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কই কোথাও ত কোন শব্দ নাই। সব নিস্তব্ধ। শুধু আমগাছের শাখায় পাখীর নীড়ে পক্ষঝাপটার শব্দ, শুষ্কপত্রের

মর্ মর্ রব। গাছের ঘন ঘন পাতার আড়াল দিয়া জ্যোছনার রজত-কণা পুকুরের কালজলে নাচিতেছে-খেলিতেছে-দুলিতেছে। একটা পাপিয়া সহসা 'চোক্ গেল, চোক্ গেল' করিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। অতর্কিত মনে বিজয় বাহির বাড়ী আসিয়া ডাকিল 'রামতনু।'

'কে দাদাবাবু এসেছ! ওগো! পিসীমা! দাদাবাবু এসেছেন।' বলিয়া বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মাঝির মাথা হইতে ট্রাঙ্কটী নামাইয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল – বিজয়ও মাঝীকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিল—তাহার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল— বুঝিল 'বাবা বাঁচিয়া আছেন'।

পিসিমা আজ এমনি সময়ে বিজয় আসিবে জানিতেন, কাজেই উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়াছিলেন, এক্ষণে গৃহের দরজা খুলিয়া দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রামতনু ধমক দিয়া বলিল—'চুপ কর পিসীমা! দাদাবাবু সারাদিন না খেয়ে আছেন, খাবার দাবার যোগাড় কর— আর কর্ত্তা এখন একটু ঘুমিয়েছেন—এ কান্না শুনে জেগে উঠবেন যে। আমি বাবুর আর সব ব্যবস্থা কচ্ছি।" রামতনু তখন যথাস্থানে বিজয়ের ট্রাঙ্ক ও বিছানাপত্র গুছাইয়া হাত পা ধুইবার জল আনিয়া দিল! বিজয়ের শত আগ্রহ সত্ত্বেও সেদিন আর তাহাকে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট যাইতে দিল না—আজ

সাতদিন বিনিদ্র দিবা-রজনী অতিবাহিত করিয়া রোগী একটু ঘুমাইতেছে—যদি কোন রূপে নিদ্রা ভঙ্গ হয়—তাহা হইলে আরোগ্যের আশা আর থাকিবে না—চিকিৎসকের এই আদেশ বিজয়ের পক্ষে কঠোর হইলেও সে তাহা দৃঢ়তার সহিত পালন করিল।

পরদিন পিতাপুত্রে দেখা হইল। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় পুত্রমুখ দর্শনে ক্ষীণকণ্ঠে আনন্দ গদগদ স্বরে বলিলেন—

'বাবা, এখন আমি সুখে মর্‌বো।'

বিজয় বলিল—'আমার কি উপায় হবে বাবা?

'সংসারের এই রীতি, বাবা। ডাক পড়েছে আর থাক্‌বার যো নেই যেতেই হবে। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি সময় অতি নিকটে, শুধু তোমায় দেখবো বলেই আমি মরণকে কোন মতে এগুতে দিই নি। বাবা কাছে এস।' বৃদ্ধ বিজয়কে দুইখানি শীর্ণ কম্পিত বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

গৃহখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তক্তপোষের উপর পরিষ্কার ধপধপে বিছানা, বিছানায় রুগ্ন ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় শায়িত। সুগৌর দেহকান্তি আজ শীর্ণ, বিবর্ণ, মৃত্যু কালিমাসমাচ্ছন্ন।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বলিতে লাগিলেন।

"বিজয়, বাবা। তুমি সুখী হবে মনে করে বড় ঘরের মেয়ে এনে বিবাহ দিয়েছিলেম, ভেবেছিলেম এই লক্ষ্মী-হীন গৃহে মালক্ষ্মীর

শুভ পদার্পণে আবার লক্ষ্মীশ্রী দর্শন কর্‌বো আবার রাজরাজেশ্বরী জননীকে প্রাণভরে মা বলে ডাক্‌বো! বড় ভুল বুঝেছিলাম, গ্রামের লোকের মানা না শুনে বড় ভুল করেছিলাম, শুধু তোমার দিকে চেয়ে তুমি সুখী হবে মনে করে আমি আর কোন দিক্ চিন্তা করবার অবসর পাই নাই!" বৃদ্ধ একটু চুপ করিলেন, বিজয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে বিবর্ণ মুখে হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনের মধ্যে ব্যাকুল আগ্রহে পিতার কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন! বৃদ্ধ আবার বলিলেন—'বাবা, যখন বুঝলেম, আমি আর বাঁচবো না, বৌমাও আর ছেলে মানুষটী নন, তখন একবার শেষ দেখা দেখ্‌বার জন্যে বেয়াইকে ও বৌমাকে চিঠি দিয়েছিলুম, কি জবাব পেয়েছি দেখ।" শীর্ণ কম্পিত হস্তে উপাধানের তল হইতে দুইখানা খামে ভরা চিঠি বিজয়ের হাতে অর্পণ করিলেন। এত চিঠি নয়—এযে দারুণ শেল—এযে প্রাণহীন নির্ম্মম মায়া-মমতা-বিহীন রাক্ষসের শোণিত-লেখা। কি আস্পর্দ্ধা! বিজয় যদি চিরদিনের জন্য শ্বশুর গৃহে থাকিতে রাজি হয় তাহা হইলেই তিনি তাঁহার কন্যাকে এসময়ে পাঠাইতে সম্মত আছেন নচেৎ নহে। আর কমলা লিখিয়াছে সে তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবার অধিকার তাহার নাই, তারপর অমন কুস্থানে থাকিতেও সে অভ্যস্তা নহে।" পত্র দুখানা পড়িয়া বিজয়ের সর্ব্বশরীর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে রাগ কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, সে মনে ভাবিল কমলার ত কোন

দোষ নাই, এখনও তাহার ভাল মন্দ বিবেচনার সময় হয় নাই। পিতার অমতে কার্য্য করিবার শক্তি ত তাহার নাই।

'পত্র পড়্‌লে ?"

'হ্যাঁ বাবা ! তবে—

'তবে কি, বলনা ? কি বল্‌বার আছে, বুঝ্‌তে পাচ্ছ, আমি ছেলে বেচিনি—এ অপমান সইবো কেন ? আমি দরিদ্র, তাই আমার পুত্রবধুও আমার সেবা করতে কুণ্ঠিত, এযে কি কষ্ট তা তুমি বুঝ্‌তে পারবে না ! শাস্ত্রকাররা যথার্থই বলেছেন—বড়র সঙ্গে ছোটর কখনও খাপ খায় না !"

'বাবা। আপনি যদি আদেশ দেন তা হলে আমি আবার চিঠি লিখে দেখ্‌তুম।'

'বেশ !'

যথা সময়ে বিজয় পত্র লিখিল—নির্দ্ধারিত দিনে রাধাকান্ত বাবুর উত্তর আসিল 'কমলা পীড়িতা বিজয়ের এখনি তথায় যাওয়া কর্ত্তব্য।' ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, বিজয়কে বলিলেন 'বাবা, আমার পাদস্পর্শ করে শপথ কর, আমি যে কথা বল্‌বো তাহা পালন করবে।" পিতৃবৎসল পুত্র চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল 'আজ্ঞা করুন।"

'বিজয় ! যে পর্য্যন্ত না তোমার পত্নী তোমার নিকট এসে ক্ষমা না চাইবে আমার দরিদ্র কুটীরে এসে তোমার দাসীর মত সেবা

না করবে ততদিন বাবা ! তুমি তোমার পত্নীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে পারবে না। এ আমার শেষ আদেশ। আমার আর কিছু বলবার নাই। মা তারা !" বলিতে বলিতে অশ্রু-জল-সিক্ত বদনে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

কি ভীষণ আদেশ, কি কঠোর নির্ম্মম আজ্ঞা। বিজয়ের প্রাণে বজ্রাঘাতের ন্যায় দারুণ ব্যথা লাগিল ! মেঘাবৃত রজনীর গাঢ় অন্ধকারে বিজলীর উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় তাহার অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-আকাশে কমলার উজ্জ্বল রূপশিখা সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গেল ! এ আদেশ লঙ্ঘনের ক্ষমতা বিজয়ের নাই—পিতৃভক্ত পুত্র পিতার চরণোপান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

* * * *

তারপর—একদিন শ্মশানের প্রবল-বহ্নি বৃদ্ধ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নশ্বর দেহ চিরদিনের জন্য ভস্মীভূত করিয়া দিল। সে দিন সেই শ্মশানে বসিয়া শোক ও বিষাদের দারুণ আঘাতে বিজয়ের আপনাকে বড় একা বলিয়া বোধ হইতেছিল। নাই—আপনার বলিতে ত তাহার কেহই নাই। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ—সীমাহীন—অনন্ত-তারা-চন্দ্র-বিভূষিত, আর নিম্নে এই বিস্তৃত শ্যামলা ধরণীর বুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় সে একা আশ্রয়-হীন নিঃসম্বল—"একা বড় একা !"

চার

'দিদি !'

'কি ভাই !'

'একটা গান গা'না ভাই ?

'কেন ? শৈলেশ চলে গেছে বলে তোর বিরহে সান্ত্বনা দেবার জন্য গাইব নাকি ?'

'যা—ও ! তুমি বড় দুষ্টু !'

শৈলেশ ঠিক্ সেই দিনই তাহার কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। ইন্দিরা স্বামীর বিদায়দিনে বাস্তবিকই বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার একটু কারণও আছে। কমলা ও বিজয়ের মধ্যে বিধাতা যে ব্যবধান রচনা করিয়া মিলনের অন্তরায় ঘটাইয়াছিলেন—ইন্দিরা ও শৈলেশের মধ্যে তাহা হয় নাই। প্রথম যৌবনে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের মধ্যে দুষ্ট মন্মথ যে প্রণয়-লীলা জাগাইয়া তোলে, তখন সে মিলন যদি মধুর হয়, তাহা হইলে সারা জীবন-পথ বেশ সুখের হয়। যেখানে তাহার বাধা জন্মে—সেখানেই নানা অশান্তির উদ্ভব হয়।

শৈলেশের পিতা পুলিশের চাকুরী করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তি স্বীয় বাসগ্রামে প্রাসাদতুল্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবকাশের দিনগুলি পরমানন্দে অতিবাহিত

করিতেছিলেন। তাহার বাড়ী আধুনিক বিলাসিতার সাজসজ্জা-নুযায়ীই সুসজ্জিত হইয়াছিল। তিনি টাকা জিনিষটাকে বিশেষ-রূপেই চিনিতেন, জমিদার বৈবাহিকের সঙ্গে যাহাতে কোনরূপ বিদ্রোহ না বাধে, সেজন্য তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল—এজন্য শৈলেশ শ্বশুরবাড়ীর প্রীতি ও সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী পত্নীর নবীন প্রণয়সোহাগ অজস্র ভাবে অর্জ্জন করিয়া পরম প্রীতিতে যৌবন-তরণী ভাসাইয়া দিয়াছিল।

শৈলেশের পিতা ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সহিত রাধাকান্ত বাবুর কলহ—ও স্বামী গৃহের প্রতি কমলার স্বাভাবিক বিদ্বেষ-বহ্নি যাহাতে ক্রমশঃই প্রবল ভাবে জ্বলিয়া ওঠে সেজন্য ইন্ধন যোগাইবার যথেষ্ট কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শৈলেশও এবিষয়ে উদাসীন ছিল না। সে সর্ব্বদা রাধাকান্ত বাবু ও কমলার নিকট বিজয়ের সম্বন্ধে নানারূপ বিদ্রূপ-পূর্ণ শ্লেষ বাক্য দ্বারা তাহার দারিদ্র্যের কথা অতি-রঞ্জিত এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ভাবে বর্ণনা করিত।

কমলার কথায় ইন্দিরা বলিল "দিদি, আমার বিরহ এইত সবে সুরু হলো, আর খুব বেশী দিন স্থায়ী হ'বে বলেও বোধ হয় না। কিন্তু তোমার? নিজের বেলা একবার ভেবে দেখদেখি?"

"যার মাথা নেই তার আবার মাথা ব্যথা?"

'দিদি, মাথাও আছে, সুতরাং ব্যথাও আছে, তবে যন্ত্রণার মাথাটা যে অতিমাত্রায় কম সে কথাটা আর কি করে অস্বীকার করি

বল? আমি হ'লে কিন্তু পারতুম না, তোমাকে দেখে আমার সময় সময় মনে হয়, তুমি বুঝি পাষাণে গড়া—পাষাণেরও ব্যথা আছে সেও আঘাতের সাড়া দেয়,—কিন্তু তুমি'—।

ইন্দিরা আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কমলা তাহাতে বাধা দিয়া সহসা বলিয়া উঠিল,—

"গাইতে বল্‌ছিলি না? কি গান গাইব বল্ না?" বলিতে বলিতে কমলার মুখ সূর্য্যাস্তের বিবর্ণ কমলের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। মুখের হাসি বিদ্যুৎবিকাশের মত ক্ষণকাল মধ্যেই লোপ পাইল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই সে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল। ইন্দিরা দিদির এই বিচিত্র ভাববৈচিত্র্যটুকু দিব্য আরামের সহিত উপভোগ করিল। সে তখন মৃদু হাসিয়া বলিল "তোর যা' ইচ্ছা তাই গা' দিদি!"

কমলা পিয়ানোর নিকট একখানি ছোট টুলের উপর বসিয়াছিল। তাহার পরিধানে বাসন্তী রংয়ের সাড়ি, চুলগুলি এলায়িত, বাতাসের কোমল স্পর্শে ফণিণীর মত নৃত্য করিতেছিল। ইন্দিরা একখানা কৌচের উপর অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় থাকিয়া দিদির সহিত কথোপ-কথন করিতেছিল। বাহিরের নির্জ্জন রাজপথ দিয়া কয়েক জন মুটিয়া রমণী পিঠে মোট লইয়া অবলীলাক্রমে দুরুহ পার্ব্বত্য পথে দূর গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আকাশ নির্ম্মল-নীল—শ্বেত-শুভ্র মেঘলা ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল। কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘাবগুণ্ঠনে

আচ্ছাদিত। দূরে ঘন নীল তুঙ্গ গিরিশ্রেণী স্বপ্ন রাজ্য বুকে লইয়া বিরাজমান। মৃদুমন্দ বায়ু ফুটন্ত প্রসূন রাজির সুরভি বহিয়া আনিয়া কক্ষমধ্যে বিলাইয়া দিতেছিল। কমলা পিয়ানোর সুরে সুর মিলাইয়া গাহিল—

বাঁশী বাজে কোথা কে জানে ?
কেন প্রাণ উধাও ছোটে জানিনা কোন্ খানে।
কে ডাকে কোন গগন পারে,
কে ডাকে কোন্ সাগর তীরে,
ঢেউয়ে আসে প্রাণের ডাক বাঁশীর তানে !
সে ডেকেছে যেতে হবে,
আকুল করে বাঁশীর রবে,
কোথা সে প্রাণের বঁধু জীবন-মন কে বল জানে !

গান শেষ হইলে সে চাহিয়া দেখিল পশ্চাতে জননী তারাসুন্দরী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখ ম্লান, চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। কমলা জননীর এইরূপ বিষাদময় মুখচ্ছবি দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল,—

"মা ! মা ! কি ? কি হয়েছে মা ? তোমার চোখে জল কেন ?" তারাসুন্দরী কন্যার চিবুকস্পর্শ করিয়া স্নেহভরে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন "কমল ! তোর শ্বশুর এ জগতের মায়া ত্যাগ করেছেন, তিনি আজ পরলোকে, আজ কয়েকদিন

হ'ল এ সংবাদ এসেছে, এত দিন তোকে খবরটা দিই নি, কিন্তু আর না দিলেত চলেনা মা!" কমলা পিওনোর উপরটা চাপিয়া ধরিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। কোনও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, সে জানেনা, বুঝিতে পারিতেছিল না, কেন আজ তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে---কেন তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। সে নত হইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল— ফোটা ফোটা করিয়া অশ্রু নয়ন বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তারাসুন্দরী কহিলেন—'ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় দেশের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, অমন লোক কি আর হ'বে? আহাহা! বেচারা বিজয়! আজ তার ত আর আপনার বল্‌তে কেউ রইল না। তার মা নেই, আমিই তার মা! কমল, তোকে তিনি নন্দনপুর না পাঠিয়ে কি অপরাধই কল্লেন!"

"আর তোমার সে ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বেনা।" একথা বলিতে বলিতে ক্রোধ বিকম্পিত দেহে রাধাকান্ত বাবু সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন 'তোমার কথায় তোমার অনুরোধে আমি বিজয়কে টাকা পাঠিয়েছিলুম, সে টাকা ফেরৎদিয়েছে। আর দেখ কি লিখেছে— অর্থশালী শ্বশুরের অর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ কর্‌তে সে রাজি নহে, দরিদ্র পিতার শ্রাদ্ধে দরিদ্র পুত্রের ভক্তির তর্পণই আদরণীয়। বিধাতা যে বন্ধন খুলিয়া ফেলিতে চাহেন, সেই নাগপাশে কোনরূপেই আর আপনাকে জড়াইতে চাহেনা। আজ সে মুক্তি পাইয়াছে এবং সে মুক্তি

তাহারাই দিয়াছেন। কমলাও তাহার প্রাণে যে আঘাত দিয়াছে তাহার হৃদয়ের সে ক্ষত আর কিছুতেই শুকাইতে পারেন না। গুরুজনের নিন্দা করিয়া সে স্বর্গগত পিতার রোষভাজন হইতে চাহেনা, কাজেই তাঁহারা তাহাকে মার্জ্জনা করিলেই তাহার তৃপ্তি ও শান্তি। আর যদি তাহা নাই হয় তাহা হইলেও তাহার ক্ষোভের কোন কারণ নাই।"

তারাসুন্দরী বলিলেন 'তুমি কমলকে পুরুষের মত মানুষের হাতে দিয়েছিলে কিন্তু তুমিই তৈরী মন্দির চূর্ণ করে দিলে। আমার কথা না শুনেই সর্ব্বনাশ কল্লে!' রাধাকান্তবাবু গর্জ্জিয়া বলিলেন—'গরিবের ছেলের এতবড় কথা! আমি কিছুতেই ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌বোনা। আজ বিজয়ের এ ব্যবহার আমাকে যে আঘাত করেছে, সে আঘাত কত গুরুতর তুমি জান—সে আমার অস্থি চূর্ণ করেছে!'

"কি যে তুমি বলো, বুঝতে পারিনে। অপরাধ হ'ল আমাদের, আর তুমি দোষ দিচ্ছ একটী নিরাশ্রয় দরিদ্র বালককে, যে আজ স্নেহের কাঙ্গাল! দু' একদিনের জন্য মেয়েকে নন্দনপুর পাঠালে কি অপরাধ হ'ত? তুমিই মেয়েটার পরকাল খেলে? তেজস্বিনী তারাসুন্দরী চিরদিনই স্বামীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, যদিও তাহার কোন কথাই রাধাকান্ত বাবু গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেন না। সাধ্বী পত্নী সেজন্য বিন্দুমাত্রও ব্যথিতা না হইয়া আরও

দৃঢ়তার সহিত স্বামীর খাম্‌খেয়ালীর প্রতিবাদ করিতেন। ইন্দিরাও মাতৃআদর্শে গঠিত হইয়াছিল, সে মায়ের কথানুসারে সাধ্যমতে চলিতে চেষ্টা করিত বলিয়াই স্বামীগৃহে প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। কিন্তু কমল পিতার প্রতি যতটা অনুরক্ত ছিল মায়ের প্রতি তেমন ছিলনা, এজন্য রাধাকান্ত বাবুরও জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতিই একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দৃষ্ট হইত। কমলার শ্বশুরালয়ে না যাওয়ার মূলে রাধাকান্ত বাবু যতটা দায়ী—তারাসুন্দরী ততটা নহেন। বিজয়ের দারুণ পিতৃশোক ও অর্থক্লেশ চিন্তা করিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় বাস্তবিকই বড় ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ধনী-গৃহিণী হইয়াও ত তিনি কেহই নন, তাহারত কোন দিকেই কোন হাত নাই, কি উপায় তিনি করিতে পারেন।

রোগশীর্ণা তারাসুন্দরী উত্তেজনা বশে স্বামীকে কতকগুলি কটুকথা বলিয়া স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্যতাবশতঃ একখানি কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন! রাধাকান্ত বাবু পত্নীকে তদবস্থায় দেখিয়া আর কোন কথা বলিলেন না।

পাঁচ

অমল লীলার সহিত বিবাহের প্রস্তাবটা এমনি অসম্ভাবিতরূপে পাড়িয়া ফেলিল যে, বরদাবাবু খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখের

দিকে তাকাইয়া শেষটায় মুক্ত জানালা পথে দৃষ্টি ফিরাইলেন এদিকের কোন কথায় আর তাহার মন রহিল না। সারাদিনের প্রবল বর্ষণ শেষে শুধু এই সন্ধ্যায় বৃষ্টিটা একটু ধরিয়াছে। পথ কাদা ভরা—তেমন লোকজন নাই, মাঝে মাঝে দুই একটা ছ্যাকড়া গাড়ী ঘড় ঘড় করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বরদা বাবু মুক্ত বাতায়ন পথে রাস্তার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

অরুণা পিতার এই স্তব্ধভাব দেখিয়া কহিল "বাবা, অমলবাবুর কথার যে কোন জবাব দিলে না?" তাহার এই কথা কয়টীর মধ্যে যেন একটা বেদনার সুর বাজিতেছিল, সেদিকে অমল বা বরদাবাবু কাহারও লক্ষ্য ছিল না। অরুণার কথায় বরদাবাবুর খেয়াল হইল, তিনি অমলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আমিত এ রকম একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না।"

"তা হলে অমলবাবু হঠাৎ এ রকম প্রশ্ন—বলিতে বলিতে অরুণা থামিয়া গেল। বরদাবাবু কন্যার কথার কোনও উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে তাহার পক্ক শ্মশ্রুতে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে মৃদু স্বরে বলিলেন, "লালা কি তার মত জানিয়েছে অমল?"

অমল কম্পিতকণ্ঠে বলিল "না, তার সঙ্গে এ প্রসঙ্গ উঠ্‌বার কোন সময় হয় নাই। আপনার মতই যে সব চেয়ে বড়, যদি আপনি—"

বরদাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন "সে কি করে হয় অমল! আমি যে তোমার কথা ভাল করে বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।"

অমল বলিল "আপনার অভিপ্রায় হ'লেই তার মত হবে।"

"তা হয় না অমল! বিবাহ জিনিষটাকে ছেলে খেলা বলে মনে করলে ত চলে না, এ ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের উভয়েরই একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মত থাকা ভাল। আমি বাপ বলে তার সেই ন্যায্য অধিকারের উপর হাত দিতে রাজি নই।"

লীলা ও অরুণা যে তাঁহার বড় আদরের ধন, সংসারের একমাত্র অবলম্বন। সে আজ কত দিনের কথা। প্রথম যৌবনে পত্নী করুণাময়ী এ দু'টী শিশু কন্যাকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া ওপারে চলিয়া গেলে বিপত্নীক বরদাবাবু কত কষ্টে তাহাদের লালন পালন পালন করিয়াছেন। যৌবনে বিপত্নীক হইয়া চির জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়া আসিতেছেন। কন্যা দু'টীকে মানুষ করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের একমাত্র সুখ ছিল—আজ তাহারা উভয়েই শিক্ষিতা। লীলা দুই বৎসর হইল এম, এ পাশ করিয়াছে, অরুণা বি, এ, ক্লাশে পড়িতেছে। বরদাবাবু বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন লইয়া মেয়ে দু'টীর অভিভাবকত্বে শান্তিতে দিন কাটাইতেছেন।

অরুণা একটা সোফার উপর বসিয়া এক দৃষ্টে অমলের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল হায়! হতভাগ্য, যে তোমাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহে, যে তোমাকে চাহে না, তুমি কিনা তাহারি দৃঢ়বদ্ধ হৃদয়-দ্বারে বৃথা আঘাত করিতে চাহ! তবু তোমার কামনা মিটিতেছে না! কেন লীলার মত রূপ,

যৌবন, শিক্ষা দীক্ষা লইয়া কি আর কোন রমণী বাঙ্গালা দেশে জন্মে নাই ?

অমল আজ হৃদয়ে বল বাঁধিয়া আসিয়াছিল, স্থির করিয়াছিল যে আজ সে আর কোনরূপেই আপনাকে লজ্জার ক্ষীণ আবরণে ঢাকিয়া রাখিবে না। নব পরিণীতা বালিকা বধূর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণের প্রস্ফুট কাকলির মত আজ সে আর তাহার মনের বাসনা অপ্রকাশ রাখিবে না। আজ সে বলিবেই,—কিসের লজ্জা ? দিন দিন তিলে তিলে হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং একদিনে—এক মুহূর্ত্তেই তাহার মাথায় বজ্রাঘাতের মত দারুণ মর্ম্মান্তিক নিষেধ-বাণী ধ্বনিত হউক না ! সে ত আজ তাহাই শুনিতে চাহে !

অমল ধনী জমিদার সন্তান। ব্রাহ্ম। তাহার পিতা কাশীনাথ বাবু একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন। কেশব সেনের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর কেবল ধর্ম্মের গোঁড়ামির সংকীর্ণ খাতে ঘুরপাক খাইতে খাইতেই তিনি অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। পিতার মৃত্যুর সময় অমল তরুণ যুবক।

পিতার মৃত্যুর পর অমল দেশের বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পড়াশুনার জন্য কলিকাতাতেই আসিয়া স্থায়ী আড্ডা গড়িয়া বসিল। সকল শ্রেণীর লোকের সহিতই অমলের পরিচয়টা ঘনিষ্ঠাকার ধারণ করিয়াছিল।

যেখানে অর্থ সেখানেই মান—ইহাই সংসারের চিরন্তন প্রথা। সংসারে ধনবানের শত দোষরাশি, শত চরিত্রহীনতাও গুণের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। লোকে মুখ ফুটিয়া ধনবানের নিন্দা করে না, পাছে অদৃষ্টে লাঞ্ছনা ঘটে। অমল তিনবার বি, এ ফেল করিয়া পড়াশুনায় ক্ষান্ত দিয়াছিল। মাতা শান্তশীলা পিতার মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পরেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, কাজেই মধুচক্র পরিবেষ্টিত যুবক অমল, শুধু বিলাস ও রূপের উপাসনায়ই আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিল। সমাজের সকলেই অমলের চরিত্র বিশেষরূপে জানিতেন, কিন্তু সমাজের উন্নতিকল্পে চাঁদা দিতে সে কখনও ব্যয়কুণ্ঠ ছিল না, কাজেই সে সমাজের প্রত্যেক কার্য্যেই একজন প্রধান পাণ্ডা ছিল।

মাঘোৎসবের কোন একদিন লীলার মধুর সঙ্গীত ও তাহার অপূর্ব্ব লাবণ্যময় মুখশ্রী দেখিয়া অমল তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িল। এ ভালবাসা রূপের মোহ কি প্রাণের প্রকৃত আকর্ষণ তাহা বুঝিবার সুযোগ তখন ছিল না। রূপের মোহই নারীর প্রতি পুরুষকে প্রথম টানিয়া লয়, রূপের নেশা কাটিয়া গেলে তবে ত গুণের পরিচয়! মদের নেশার মত অমলের এমনি একটা নেশা জন্মিয়া গিয়াছিল যে সে লীলার সহিত পরিচয়ের ব্যবস্থাটা অতি শীঘ্রই করিয়া ফেলিল। তারপর প্রতিদিন যেখানে সেখানে সুযোগ পাইলেই সে নানা কৌশলে তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত,—ক্রমে সে বরদাবাবু ও অরুণার সহিত তাহার

পরিচয়টা করিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বরদা বাবুর ওখানে তাহার চা পান ও নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতে আরম্ভ করিল। বরদাবাবুর বাহিরের সকলের সঙ্গে মিশিবার বয়স বা কৌতুহল ছিল না, কাজেই এই তরুণ উচ্ছৃঙ্খল যুবকটীর সঙ্গ প্রথম প্রথম তাঁহাকে পীড়া দিলেও পরে ইহার সরল অমায়িক ব্যবহার ও গল্প করিবার অদ্ভুত ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বরদাবাবু প্রেততত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বড় ভালবাসিতেন—এ বিষয় তাঁহার পড়াশুনাও যথেষ্ট ছিল, অমল অল্প কয়েক দিনের আলাপের পরেই তাহার এই খেয়াল বুঝিতে পারিয়া প্রতিদিনই পরলোকতত্ত্ব লইয়া আলোচনা সুরু করিয়া দিত, নিজেও লাইব্রেরী ঘুরিয়া পুঁথি আনিয়া মাঝে মাঝে দু' একটা নূতন কথা বলিয়া—ধীরে ধীরে বৃদ্ধের স্নেহ আকর্ষণ করিতেছিল—অমল ও বরদাবাবুর তর্কে মাঝে মাঝে লীলা ও অরুণা যোগ দিত, কাজেই অমল যে অভিসন্ধি বুকে লইয়া এ পরিবারের সহিত তাহার পরিচয়টা ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছিল—তাহা ক্রমশঃ সাফল্যলাভ করিতেছিল। কিন্তু সে তেমন করিয়া লীলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলা মেশার সুযোগ করিতে পারে নাই—লীলা অমলকে দেখিলেই ভীতা হরিণীর মত পালাইবার সুযোগ খুঁজিত। অমল প্রতিনিয়ত বাধা পাইতে পাইতে রক্তাপপাসু ব্যাঘ্রের মত শোণিত সন্ধানে অতি মাত্রায় উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে

কেবলি জাগিতেছিল তাহাকে চাই! তাহাকে চাই! যেমন করিয়াই হউক তাহাকে চাই। শেষটায় আর কোনরূপে আপনাকে সংযত করিতে না পারিয়া আজ সে বরদাবাবুর নিকট সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে লীলার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিল।

অমলের সহিত লীলার কোনরূপ প্রণয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এ কল্পনাও বরদাবাবুর পক্ষে মর্ম্মান্তিক। সংসারে কি শুধু অর্থই বড়? মনুষ্যত্বের কি কোন মূল্যই নাই? চরিত্র মানব জীবনের গৌরব মুকুট; অবশেষে কি লীলা এক বিলাসী ধনী যুবকের বিলাস সামগ্রী হইবে? অসম্ভব! অসম্ভব! অমলের প্রস্তাবে বরদাবাবু প্রথমে বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, যদি লীলা অমলকে কোনরূপে তাহার সম্মতি জানাইয়া থাকে তাহা হইলে ত তাঁহার আর কোন কথা বলিবার থাকিবে না। শিক্ষিতা কন্যার মনোনীত পাত্রকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়? অমলের সহিত কথাপ্রসঙ্গে যখন তাঁহার মনের ভয়টা দূর হইল, তখন তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"সেত হ'তে পারে না অমল!"

অমলের কাণে বরদাবাবুর কথা গম্ভীর বজ্রের ধ্বনির মত শুনাইল—সে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর বরদাবাবুকে ও অরুণাকে নমস্কার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিবা মাত্রই সে দেখিতে পাইল লীলা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। রাত্রি

তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, এত রাত্রি পর্য্যন্ত অমল এখানে আছে, লীলা ইহা জানিতে পারে নাই, কাজেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাকে এখানে দেখিতে পাইয়া লীলার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল।

সে অমলের দিকে তাকাইয়া নত মস্তকে একটী সোফার উপরে বসিয়া পড়িল। অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—কি রূপ! কি মাধুর্য্য? এমন রূপত সে কখনও দেখে নাই, দীর্ঘ সুঠাম সুন্দর দেহলতা, উজ্জ্বল—অতি উজ্জ্বল কৃষ্ণ নয়ন, হাসিভরা মুখখানি, এলায়িত কুন্তলা, সুবসনা রমণীর অপূর্ব্ব রূপ লহরী তাহাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। জ্যোছনা মাখা পূর্ণসরসীর জলে ঢিল ছুঁড়িলে যেমন তাহা উছলিয়া উঠে, তেমনি লীলার যৌবন-শ্রী পুষ্পিতা লতার মত রূপ তরঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছিল। অমল কোনরূপে হাত দু'খানি তুলিয়া লীলাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"ভাল আছেন ত মিস্ রায়?" লীলা প্রতি নমস্কার করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, আপনি ভালত?' এদু'টা কথা বলিয়াই সে পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "বাবা! আমি সেই যে কাজের কথা বল্‌ছিলুম সে কাজটা আমার হ'য়েছে, কল্‌কাতার গোলমাল ছেড়ে দিন কতকের জন্য হাঁফছেড়ে বাচবো; ওয়ালটায়ার বেশ জায়গা, নয় বাবা?"

একথা কয়টী আমলকে শুনাইয়া বলিবার উদ্দেশ্য যে কি তাহা জানিতে অমলের বাকী রহিল না।

"হ্যাঁ আজ অনেক রাত্রি হয়েছে, খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, উপরে চল বাবা।" এই বলিয়া লীলা পিতার হাত ধরিয়া একরূপ তাহাকে টানিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল, যাইবার সময় সে অমলের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। বরদাবাবুও যেন অন্যমনস্ক ভাবে অমলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে অরুণা কহিল "আজ আপনি বড় আঘাত পেয়ে গেলেন অমল বাবু।" কথাটা বলিতে অরুণার গলাটা যেন একটু ভিজিয়া ভারি হইয়াছিল।

অমল কহিল—"কিছু নয় মিস্ রায়! জানিনা, যত আঘাত পাই। যত বাধা পাই ততই যেন আমার হৃদয়ের আবেগ আরও প্রবল হয়ে উঠে। বুঝ্‌তে পারিনা কেন আমার এমন হ'ল।" অরুণা মনে মনে কহিল "উঃ এতদূর।" অমল ধীরে ধীরে দরোজার দিকে চলিতে চলিতে কহিল—"এখন তবে যাই, আপনাদের আজ বড় বিরক্ত কল্লুম—ক্ষমা কর্‌বেন!"

"সেকি কথা! বরং আপনিই আজ—অমলের হৃদয়ে তখন আগুণ জ্বলিতেছিল—হৃদয় মাঝে কে যেন শুধু বলিতেছিল 'তাহাকে চাই তাহাকে চাই, যে করেই হয় তাহাকে চাই।' সে আর কোন কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া চলিয়া গেল—দৈত্যের মত গর্জ্জন করিতে করিতে মোটরকার তাহাকে লইয়া অদৃশ্য হইল।

অরুণা জানালা দিয়া সেই পথের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া

রহিল। রূপ, যৌবন, স্বার্থ, অর্থ, বিদ্যা যাহাতে পুরুষের সৌরভ—অমলের মধ্যে ত অল্প বিস্তর তাহার সমুদয়ই আছে, এত ভালবাসা—এত প্রেম দিদি কিনা সব উপেক্ষা করিল? অমল যদি এমনি করুণভাবে—এমনি প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ে এমনি করিয়া আজ তাহার প্রণয়—প্রার্থী হইত, তাহা হইলে সে বোধ হয় কখনও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না।

লীলা ও অরুণা দুই সহোদরা হইলেও তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি গত অনেকটা পার্থক্য ছিল। লীলা শান্ত, ধীর, স্থির, দৃঢ়চিত্ত এবং স্নেহশীলা। অরুণা রূপে তাহার দিদির সমকক্ষ না হইলেও সেও যে রূপসী তাহা অতি সত্য কথা। তবে সে তাহার দিদির মত শান্ত সুশীলা নহে, স্বভাবে সে উগ্রা, বচনে সে কঠোরা এবং বিলাসের দিকে তাহার ঝোঁকটা অতিমাত্রায় বেশী। অমল লীলাকে ভালবাসে, তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল—অনেক দিন হইতেই অরুণা তাহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। লীলার ঔদাসীন্য ও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ব্যাধ যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া শিকারের সন্ধানে ফিরে, অরুণা ও সেই দৃষ্টি লইয়া উভয়ের গতি-বিধি লক্ষ্য করিত। সেদিন অমল প্রত্যাখ্যাত হইয়া চলিয়া গেলে অরুণা যেন সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এবার যে তাহার পালা। একবার সে দেখিবে অমল তাহার চরণতলে লোটাইয়া পড়ে কিনা! তবু সে আপনার উপর খুব জোর করিয়া বিশ্বাস

স্থাপন করিতে পারিতেছিল না। দূরে থাকিয়া লক্ষ্য করা যত সহজ, কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ঠিক্ সেইখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সকলের চক্ষেব সম্মুখে জয় পরাজয়ের মধ্যে দাঁড়ান তত সহজ নহে। নদীর স্রোতের গতির মত অমলের হৃদয়-স্রোত ফিরাইয়া আনিয়া ঠিক্ তাহারই দিকে পরিচালনা করা কি বড় সহজ ? রূপের প্রথম আকর্ষণ, যৌবনের প্রথম প্রেমের লালসা যে একটানা পাহাড়িয়া নদীর মত। সে যে শুধু এক লক্ষ্যেই চলিতে চাহে। কোন বাধাই যে তাহাকে ফিরাইতে পারে না। ঠিক্ সেই একটানা স্রোতের গতি ফিরাইবার শক্তি তাহার আছে কি ? অরুণার মনে যে একথাগুলি জাগে নাই তাহা নহে, কিন্তু তবু—তবু সে আপনাকে সামলাইয়া রাখিবার জন্য ব্যগ্র না হইয়া অথচ বাহিরের চক্ষু হইতে গোপন রাখিয়া পাকা শিকারির ন্যায় শিকার হাতে পাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। অরুণা শৈশব হইতেই সাজসজ্জা ও বিলাসিতার পক্ষপাতিনী, কলেজেও যে বড় ঘরের মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে যতটা ভালবাসিত, সমাবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সখীত্বের জন্য ততটা ব্যাকুল হইত না। পবিত্র প্রেমই যে সকল সময় পুরুষ ও রমণীর মধ্যে মধুর বন্ধন বাঁধিয়া দেয় তাহা নহে, অনেক সময় রূপের লালসা ও ধনের লালসা নরনারীকে প্রলুব্ধ করে। অরুণার অমলের প্রতি প্রেম বা আসক্তি, অর্থ বা ভোগ লালসা ছাড়া আর কিছু নহে। সে যদি অমলের ন্যায় ধনবান জমিদার

যুবকের পত্নী হয় তাহা হইলে সে মনের সুখে নূতন নূতন সাজ সজ্জায় নূতন নূতন অলঙ্কারে সাজিয়া দশজনের একজন হইতে পারিবে। মেঘের বুকে লুক্কায়িত বিদ্যুৎ-বহ্নির মত অরুণা এই গোপন-অভিসন্ধি লইয়াই অমলকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

লীলা ও অরুণা ব্রাহ্ম-সমাজের মেয়ে, শিক্ষা দিক্ষা সমুদয়ই উক্ত সমাজের আদর্শে গঠিত হইয়াছে, তবু তাহারা বাঙ্গালী-মেয়ে-সুলভ লজ্জার হাত হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারে নাই। কলিকাতার মাটি পদে পদে যে লোক-লজ্জার ব্যবধান গড়িয়া তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে চলা ফেরার হাত হইতে দূরে দূরে রাখিয়াছিল—ওয়ালটেয়ারের মুক্ত প্রকৃতি তাহাদিগকে সে পিঞ্জরের দুয়ার খুলিয়া দিয়া বিরাট নীল গগনতলে—নীল-বারি-চঞ্চল বারিধির তীরে মন ও প্রাণের স্বাধীনতা দিয়া আদরে বরণ করিয়া লইল।

ছয়

মানুষ মনে করিলেই পৃথিবীতে সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে না, সুখ দুঃখ বিধাতার দান। এখানে মানুষকে অদৃষ্টবাদী না হইয়া উপায় নাই। অর্থ থাকিলে অভাব থাকেনা বটে, কিন্তু মনের সুখ ও শান্তি সকল সময়ে অর্থই প্রদান করে একথা বলা চলে না। রাজা

পরশমণি

নরেন্দ্রনারায়ণ বাঙ্গলা দেশের একজন বড় জমিদার, বৎসর পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি, অতি প্রাচীন বংশ, কিন্তু বিধাতা তাহাকে ধনসম্পত্তি দিয়াছেন বটে। কিন্তু মনের সুখ শান্তি দেন নাই। বিধাতার এ বিচিত্র বিধান মানুষ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। নরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রায় সপ্ততি বৎসর বয়সে যখন চিরদিনের জন্য কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির-তলে জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইয়া দিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া গ্রামবাসিদের নিকট, সন্তানতুল্য প্রজাবৃন্দের নিকট ও উপযুক্ত পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণের হস্তে সম্পত্তির ভার দিয়া কাঁধের বোঝা হাল্কা করিয়া পোটলা পুটলি বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ঠিক্ তাহার দিন কয়েকের মধ্যেই কাল, বৃদ্ধ পিতার বুকে ভীষণ আঘাত দ্বারা দেবেন্দ্রকে ওলাউঠারূপী প্রবল পরাক্রান্ত দূত প্রেরণ করিয়া সংসার হইতে ছিনাইয়া আনিল। বিধবা পুত্রবধূ বিমলা, আট বৎসরের পৌত্রী বেলা ও পাঁচ বছর বয়সের পৌত্র অমরেন্দ্রনারায়ণকে লইয়া বৃদ্ধ মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। পুত্র কোথায় তাহার সবল দেহ ও মন লইয়া বৃদ্ধ পিতার সেবা করিবে! কিন্তু বিধাতার নির্ম্মম আঘাত কিনা সব উল্‌টাইয়া দিয়া সপ্ততিপর, পরলোকের পথে বহুদূর অগ্রসর বৃদ্ধের দুর্ব্বল ক্ষীণ বাহুকে পুত্রের পরিত্যক্ত সংসার ও সন্তানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিল।

শোকের উপশম কেহ কখনও শাস্ত্রের শ্লোক বা অযথা ধর্ম্মের

উপদেশ দিয়া দূর করিতে পারে না। ধৈর্য্যই শোকের মহৌষধ—সময়ই তাহার মূল নিদান। কেবল কর্ত্তব্য যখন মাথা তুলিয়া ঝঙ্কার দেয় তখন মানুষ আপনা হইতেই শোক-দগ্ধ হৃদয়ে ধৈর্য্যের শীতল বারি সিঞ্চনে ধীরে ধীরে তাহা সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কোনরূপেই আপনাকে পল্লী-বাসে শান্ত সুস্থির করিতে না পারিয়া ওয়ালটেয়ারে পলাইয়া আসিলেন। এখানকার প্রাকৃতি সৌন্দর্য্য, নিত্য নূতন সাগরের শোভা ধীরে ধীরে তাঁহার শোকের আঘাতে প্রলেপ দিতে লাগিল। কি করিয়া ছেলে মেয়ে দু'টীকে মানুষ করা যায়, কি করিয়া বিধবা যুবতী পুত্র বধূর উদ্বেলিত শোক-সমুদ্র শান্ত হইয়া তাহাকে গৃহ কর্ম্মে নিয়োজিত করে—এ চিন্তাটায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। খেয়ার পারে দাঁড়াইয়া আপনার উপর খুব বেশী রকমের বিশ্বাস করা চলে না; তাই বৃদ্ধ বিষয়ী নরেন্দ্রনারায়ণ ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যগুলি তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, হিতৈষী দেওয়ান হরকুমার রায়ও এ বিষয়ে তাহাকে তাগাদা দিতে ছাড়িত না।

অনেক সন্ধানের পর অনেক খোজ লইয়া কলিকাতার একজন বিশিষ্ট হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শে লীলাকে ছেলে মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী এবং পুত্রবধূর সঙ্গিনীরূপে নিযুক্ত পত্র পাঠাইয়া, সে দিন অপরাহ্নে বৃদ্ধ প্রতি মুহূর্ত্তে লীলা ও তাহার পিতার আগমনের প্রত্যাশা করিতেছিলেন। দাদামহাশয়ের দুই পাশে বেলা ও অমর নূতন

পোষাকে সাজিয়া গুজিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমুদ্রের অল্প দূরে পাহাড়ের উপর বড় বাংলোখানি শোভা পাইতেছিল। পাশের আর একখানি ছোট সুসজ্জিত বাংলো লীলার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সন্ধ্যার লোহিত কিরণ-রেখা সমুদ্রের নীল চঞ্চল বারিরাশির উপর তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। চক্রবাল রেখার সহিত দূর দিগন্তে যাইয়া নীল আকাশের সহিত নীল সাগর মিশিয়া গিয়াছে। তরঙ্গের গুরু গর্জ্জন, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ক্লান্ত বৃদ্ধেরও হৃদয়ে শান্তিধারা ঢালিয়া দিতেছিল। এমন সময়ে দুখানা রিক্স আসিয়া বাংলোর কাছে দাঁড়াইল। নরেন্দ্রবাবু আগন্তুকদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইতে না হইতেই বরদাবাবু তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন "আজ গাড়ীটা একটু লেট্ হয়েছে, তাই পৌছতে একটু দেরী হ'ল।" ইতিমধ্যে লীলা আসিয়া বৃদ্ধের চরণ ছুঁইয়া প্রণাম করিলে নরেন্দ্র বাবু একটু পিছু হটিয়া বলিলেন "থাক মা থাক!" বলিতে বলিতে বেলা ও অমরকে দুই হাতে ধরিয়া আনিয়া লীলার কাছে দিয়া বলিলেন "এই নাও মা! বেলা ও অমরকে নাও! তোমার হাতে সঁপে দিলুম, এদের মানুষ করে তোল, এইমাত্র আমার আকাঙ্ক্ষা!" দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইয়া বিমলা নবাগতাকে দেখিতেছিল—বিমলার লীলাকে দেখিয়া, তাহার সুন্দর ঢলঢলে মুখখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল—না এর সঙ্গে মনের

মিল হবে, তাহার ম্লান মুখখানি শৈবাল-বেষ্টিত কমলিনীর ন্যায় বড় মলিন দেখাইতেছিল! লীলা বিমলাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"দিদি!"

বিমলা এইরূপ আকস্মিক প্রীতি-আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া লীলার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল "কি ভাই।"

"আমি যেন তোমার শোকে দুঃখে শান্তি দিতে পারি, যেন তোমার সামান্য উপকারেও কৃতার্থ হ'তে পারি।"

"তা তুমি পারবে! সত্যসত্যই তুমি আমার বোন।" দুইটী তরুণীর প্রথম দর্শনেই পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সামান্য দুইটী কথায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

বারান্দায় দু'খানি ইজি চেয়ারের উপরে অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় শুইয়া দুই বৃদ্ধ তখন তাঁহাদের জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাস আলোচনা করিতেছিলেন।

সাগরের ডাক আগেরি মত ভৈরব গানে চারিদিক মুখরিত করিতেছিল। আকাশে শত শত তারকা ফুটিয়া উঠিতেছিল!

সাত

বিমলা যখন প্রথম শুনিতে পাইল যে তাহার সঙ্গিনীরূপে এম্, এ পাশ করা একটী ব্রাহ্ম মহিলা আসিতেছেন, তখন তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল,—এ শোক দুঃখের মাঝখানে এ আবার কি জঞ্জাল ! সে তখনি যাইয়া শ্বশুরকে কহিল "বাবা ! আমি একাইতো বেশ আছি, আপনি আমাকে যতটা দুর্ব্বল মনে কচ্ছেন, আমি ততটা নই, আমার উপর বিধাতা যে গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছেন, আমি হৃদয়কে দৃঢ় করে নিশ্চিত তা বহন করতে পারবো, সে শক্তি যে আমার আছে তাও যে আপনার জানা নেই তাত নয় !"

"সব জানি মা ! তবে কি জান, তুমি একা কয়দিক্ দেখবে ! আমি বুড়ো অকর্ম্মণ্য ছেলে, আমার সেবার ভারও যে পূর্ণ মাত্রায় তোমার উপরেই পড়্লো, তারপর ছেলেমেয়ে, ঘর-সংসার সবই যে দেখতে হ'বে ! ছেলে মেয়েদের মানুষ করে তোলাই হচ্চে এখন সকলের চেয়ে তোমার বড় কাজ। যে মেয়েটি আস্ছে তাকে তোমার সঙ্কোচ বা ভয় করে চল্বার কারণত কিছু নেই। সে গোটা কয়েক পাশ করেছে এই মাত্র ; কিন্তু তুমিওত মূর্খ নও মা।"

এ কথার উপর আর কোন কথা চলে না। তারপর লীলা আসিয়া পঁহুছিলে বিমলার মনের আশঙ্কা দূর হইয়া গেল। এও যে তাদেরি মত একজন ; শুধু বেশভূষার যা একটু তফাৎ, কিন্তু কি

মিষ্ট স্বভাব! কি সুন্দর চালচলন, কি নম্র ব্যবহার! অমর ও বেলাত দু'দিনের মধ্যেই লীলার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল।

সহানুভূতি শোকের সান্ত্বনা। শোক—কাতর নর নারী মনের বেদনা অপরকে প্রকাশ করিয়াই সান্ত্বনা লাভ করে। লীলার সমবেদনা প্রকাশ, প্রত্যেক ব্যাপারে বিমলার প্রতি তাহার শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারে ধীরে ধীরে বিমলাকে আত্মপ্রকাশে উদ্বুদ্ধ করিল। যে বেদনা সে অস্থি-পঞ্জর-বিচূর্ণিত বীরের মত অসীম সহিষ্ণুতা সহকারে অম্লানমুখে বহিয়া আসিতেছিল, রুদ্ধ প্রবাহ নির্ঝর যেমন মুক্ত পথ পাইলে আকুল বেগে ছুটিয়া চলে—বিমলাও তেমনি লীলার সহানুভূতিতে, বিনয়-নম্র ব্যবহারে তুষারের মত গলিয়া গলিয়া—মর্ম্ম বেদনা কহিয়া কথঞ্চিত শান্তি বোধ করিতে লাগিল। বৈধব্যের কি যন্ত্রণা! পতিহীনা রমণী হৃদয়ের কি গভীর শূন্যতা!

শ্রাবণের সন্ধ্যা। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। চারিদিকে বিষণ্ণতা বিরাজমান। সমুদ্রের নীলজলের সহিত আকাশের কালো মেঘের কি গভীর প্রেম। শত শত বিরাট নাগিনীর মত শুভ্র ফণা তুলিয়া ঢেউগুলি লোটাইয়া পড়িতেছে। কি ভৈরব গর্জ্জন রব! কি তুমুল উন্মত্ত উচ্ছ্বাস! বিশ্ব-সংসারকে ধ্বংস করিয়া দিতেই যেন আজ প্রকৃতি—রাক্ষসীর গভীর ষড়যন্ত্র! ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে! হীমাদ্রির ধূসর শৃঙ্গে বারিপাতের অজস্র ঝর ঝর রব শুনা যাইতেছে, ডলফিন নোজের প্রান্তদেশে

আসিয়া ব্যর্থ আস্ফালনে ঢেউগুলি দৈত্য শিশুর মত আক্রোশে আঘাত করিতেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ রেখা—কালো মেঘের গলে সোনার হার, চিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছিল। অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার! চারিদিকেই অন্ধকার। বাংলোর নিভৃত কক্ষে জানালার পাশে দুই খানা চৌকিতে লীলা ও বিমলা বসিয়াছিল। ঘরের সার্সি বন্ধ। কাচের জানালা দিয়া বাহিরের সে ভীষণ ভাব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল, ঝড়ের ঝাপটে মাঝে মাঝে সার্সির কপাটগুলি ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। অমর ও বেলা অনেকক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কক্ষে মৃদু আলো জ্বলিতেছে। সুদূর অতীতের বিরহিনী গোপবধূর হৃদয়-ভেদী মর্ম্ম-কাতরতা আজ মূর্ত্ত আকারে বিমলার চিত্ত আলোড়িত করিয়া দিয়াছিল। কোথায় সে! কোথায় সেই চিরন্তন গোপকুমার! এমনি শ্রাবণ দিনের ঘন ঘোর আঁধার নিশীথে গোপ-বধূর ব্যর্থ অভিসার প্রয়াসের ন্যায় আজ বিমলার চিত্তে কোন্ অজ্ঞাত গ্রহ-নক্ষত্র-বাসী প্রিয়তমের উদ্দেশে অভিসার সজ্জার বাসনা জাগিয়া উঠিতেছিল। উঃ সে যে নাই! তবে কোথায় সে! জীবন-যৌবনের প্রথম উন্মেষে পুষ্পিতা লতাটীর মত, বসন্তের পাখীর মত, সে রূপে গন্ধে বর্ণে ছন্দে ও গানে আপনার রূপের ডালি সাজাইয়া যাহাকে উপহার দিয়াছিল আজ কোথায় সে ঈপ্সিত? কোথায় সে দয়িত? সে যে নাই! এ কথাত কোন মতেই বিমলা মনের

মধ্যে দৃঢ়রূপে গাঁথিয়া তুলিতে পারে নাই। সে আজ তাহার হৃদয় খুলিয়া সারা জীবনের প্রণয়-কাহিনী, প্রথম মিলন কথা, তারপর কর্ম্ম জীবন, সংসার-জীবন একে একে সব কথা লীলার নিকট অশ্রু ভরা চক্ষে বলিয়া যাইতে লাগিল। বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। লীলা, সে দেবীমূর্ত্তি, সে অপূর্ব্ব পতিপ্রেম-কথা শুনিতে শুনিতে নির্ব্বাক ভাবে বসিয়াছিল। এ ব্যাপার উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাত তাহার নাই। বিমলা কহিল—"লীলা তোমার কাছে আজ আমি সব বলে একটু শান্তি পাচ্ছি—আমার কথা কাকেও বলবার যে অবসর নেই! আমি অবশ হলে যে সকলেই অবশ হ'বে বোন্!"

লীলা উত্তর দিল "দিদি! ধন্য তুমি, তুমি যে কেমন করে পাষাণ চাপা দিয়ে সংসারে চল সে যে ভেবেই উঠ্‌তে পারিনে! এমন কর্ত্তব্যজ্ঞান। এমন নিষ্ঠা, এমন ভালবাসা আমিত বড় একটা দেখি নাই।"

বিমলা কহিল—"লীলা! আমার ভালবাসার দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্যই বুঝি তিনি চলে গেলেন। মরবার সময় ত একবারও বলতে পাল্লুম না "ওগো! জান না আমি তোমায় বড় ভালবাসি!" তখন যে শুধু—চিকিৎসা আর সেবার জন্যই ব্যাকুল হলেম। তখন ভাবলুম,—না সাধারণ স্ত্রীলোকের মত সেবা শুশ্রূষায় ত্রুটি করে শুধু কাঁদবো না—কাঁদবার যে ঢের সময় পাবো!

কখনো ভাবিনি যে এমন করে তিনি আমায় একা ফেলে পালাবেন। স্বামী যে কি জিনিষ তা তুমি বুঝ্‌বে না বোন! যতদিন ছিলেন ততদিন বুঝি এমন গভীর ভাবে তাঁকে ভালবাসিনি, ভালবাসা জানাতে পারিনি তখন-তখন যে তিনি বাহিরের ছিলেন, তখন তাঁকে বাহির থেকে উপলব্ধি করেছি সে যেন ছিল ফাঁকা ফাঁকা, আজ আর তা নেই লীলা! আজ তিনি আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে—বিশ্বদেবতার আসনে বসে আছেন।"

বাহিরে তখনও ঝড় বহিতেছিল, আকাশে তেমনি বিদ্যুৎ ঘটা। লীলা স্তম্ভিত ভাবে স্তিমিত প্রদীপালোকে বিমলার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কি দীপ্তি! কি তেজ! কি সৌম্য ভাব!

সহসা বিমলা বলিল—"লীলা—দিদি! তুমি কি কখনোও কাকেও ভালবেসেছ?" লীলা একটু মৃদু হাসিয়া বলিল 'না'। বিমলা বলিয়া যাইতে লাগিল—"বড় ঘরে জন্মিছি। আর বড় ঘরের বউ হয়েছিলুম বলে যে বিলাসিতাকে বরণ করে নেওয়া,—তাত কখনও পারিনি বোন্—তাঁর সেবা তাঁর কাজ নিজের হাতে গুছিয়ে না কর্‌লে যে তিনি বড় রাগ কর্‌তেন, বল্‌তেন অর্থ জিনিষটা অভাব ঘুচাবার ও বটে। তোমাদের সেবা থেকে সংসারের কাজ থেকে দূর করে দিয়ে ঠিক্ থাটি পুতুল করে তুল্‌বো এ আমি সইতে রাজি নই!' তাই আমি কোন দিন বিলাসিতাকে বরণ করে না নিয়ে কাজের ব্যস্ততার মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিলুম! কিন্তু

আজ সে কাজ কোথায়? যে দেবতার সেবার জন্য পূর্ণ আনন্দে পূর্ণ উৎসাহে কাজ করতুম, সারাদিন খেটেও কখনো ক্লান্তি বা অবসাদ উপলব্ধি করিনি আজ তিনি কোথায়? আমি যে কত বড় একাকী তিনি বুঝ্ছেন না!"

বিমলা আর বলিতে পারিল না! তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল; পতিহীনা রমণীর অন্তর-ব্যথা তখন শতরূপে শতভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। লীলা বিমলাকে সান্ত্বনা দিবে কি—কি করিবে ভাবিতে পারিতেছিল না। বিমলা, লীলার চেয়ে যে বয়সে খুব বেশী বড় তা নয়; বিমলা কৈশোরে বিবাহিতা হইয়া সংসার-চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে জ্ঞানটা লাভ করিয়াছে লীলার তাহা কল্পনার মধ্যেও আসিতে পারে নাই।

বিমলাকে সে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে? শুধু কি ভাসা ভাসা কথা বলিলেই তাহার প্রাণে সান্ত্বনা জাগিবে? তাহাত নয়! তাই লীলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "দিদি! তিনি চলে গেছেন, কিন্তু যে কঠোর কর্ত্তব্য দিয়ে গেছেন, যে ভার তোমার উপর পড়েছে, নিষ্ঠার সহিত তোমাকে তা বহন করতে হবেই, নইলে যে তিনি তোমাকে অপরাধী মনে করবেন। বিধাতা মানুষকে কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি রহস্য মনে করে নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন তাত বোঝবার জো নেই, তুমি যে অনেক কাজ করতে পার বোন্! যে প্রেম একদিন তোমার স্বামীর হৃদয়কে

জয় কর্‌বার জন্যে—তাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল, আজ সে যে বিশ্বনিখিলের জন্য আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। শোক যে সামান্যা নারীর জন্য। যার বিধান বলে পৃথিবী চল্‌ছে—যাঁর ইঙ্গিতে জগৎ পরিচালিত ; মৃত্যু যে জগতের পরিণতি, তার বিরুদ্ধে যখন আমাদের হাত নেই, নতশিরেই যখন তাঁর আদেশ পালন কর্‌তে হবে, তখন তুমি তোমার সংসারের কর্ত্তব্যের দিকে ফিরে চাও, ছেলে মেয়েদের মানুষ কর, আর তুমি কিছু মনে করো না দিদি! বিধাতা তোমাকে যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করে পাঠিয়েছেন, সে অর্থের সদ্ব্যবহার কর। নানা সৎকার্য্য দ্বারা তোমার স্বামীর নাম অক্ষয় করে তোল! দুঃস্থনরনারীর সেবা, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা কর, সৎকার্য্যের দ্বারা হৃদয়ে শান্তি আন। আমি তোমার বয়সে ছোট, বাইরের কিছু বড় একটা জানি না, শুধু ছেলেবেলা থেকে পড়া মুখস্থ করেই এসেছি! আমার যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে ক্ষমা কর বোন্।”

বিমলা খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল—“লীলা, আমি খুব ভালকরে আপনার কথা ভাব্‌বার অবসর পর্য্যন্ত পাইনি, শোকের তুমুল উচ্ছাসে হৃদয়ের মধ্যে তরঙ্গ উঠ্‌ছে, তার পূর্ণ আধিপত্য যতদিন থাকবে, ততদিন যতই কেন মুখে বলি না যে কর্ত্তব্যকে মেনে চল্‌তে পারবো, কিন্তু দেখছি মনের উপর সে বিশ্বাসটা দিন দিনই খর্ব্ব হয়ে যাচ্ছে। তুমি এসেছ পরে আমার কর্ত্তব্যের বোঝা ও যেন

অনেকটা লঘু বলে মনে হচ্চে। বেলা ও অমরকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যেন অনেকটা আরাম মনে কচ্চি। এখন যেন পিঞ্জরের এ বন্ধনকেই মুক্তির আনন্দ চেয়ে অনেক আরামের মনে হচ্চে। শোক শুধু ব্যথাদিয়েছে তা নয়, মর্ম্ম-তন্ত্রী ছিঁড়েছে তা নয়, একটা দারুণ লজ্জা ও সৃষ্টি করেছে। কারু সাম্‌নে বেরুতে ইচ্ছা হয় না, কাকেও মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে না। তাঁকে হারিয়ে যে আমি সকলরকমে আপনাকে কাঙ্গালিনী করে ফেলেছি বোন্!"

"এভাবেত চল্‌বে না দিদি! আর এখানে এসেছ, এমন সুন্দর যায়গা, এমন উদার মুক্ত আকাশ, এমন সুন্দর সমুদ্র, এমন পথ ঘাট এখানে শুধু ঘরে বসে থাক্‌লে চল্‌বে কেন? মনকে কাজ দাও, চক্ষুকে দর্শন দাও, ঈশ্বরের বিচিত্র সৌন্দর্য্যরসে আপনার চিত্তকে বিভোর করে তোল। শুধু এই ঘর, এই বাড়ী আর দিনরাত কান্না কাটা করলে ত চল্‌বে না বোন্!

তোমার শ্বশুর একজন পরম পণ্ডিত ব্যক্তি। তুমি যাতে শান্তি পাও তিনি তাই চান! চল না কাল নীমাচলে বেড়িয়ে আসি? আমি বরং তাঁকে বল্‌বো! বিধাতা যে আঘাত দিয়েছেন তা যখন দূর করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, তখন তাঁর গড়া পৃথিবীর মাঝ থেকেই আনন্দ সঞ্চয় করে—তাঁরি বিধানের প্রতিশোধ নিতে হ'বে। মৃত্যুর রহস্য ভেবে কি হবে? কেঁদে কি হবে যে বিশ্বপ্রেম আজ তোমার স্বামী তোমাকে দিয়ে গেছেন সে প্রেমে চিত্তপূর্ণ কর, দেখ্‌বে

অক্ষয় আনন্দ আপনি এসে তোমাকে বরণ করবে। এই সমুদ্র—এই শৈলকানন-কুন্তলা ধরনী যাঁর সৃষ্টি—সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র যাঁর রচনা—তাঁর সৃষ্টি—রহস্য জীবনও মৃত্যু লীলা বুঝে কাজ নেই। তাঁকে মঙ্গলময় বলে মনে করে—তাঁর প্রত্যেক বিধান নতশিরে বহন করাই হচ্চে মানুষের কাজ। আমি তোমাকে এ ভাবে ঘরে বসে থাকৃতে দোব না ; চল কাল সীমাচল বেড়িয়ে আসি।—কি বল ?”

বিমলা মৃদুস্বরে বলিল “চল। লীলা শিক্ষার একটা গুণ আছে। বিধাতার সব বিধানকে নতশিরে মেনে নেওয়ায় সাহস আমার বোধ হয় নাই, তাই কর্ত্তব্যকে বড় করে ভাব্‌বার জন্য যতটা ব্যস্ত হই, কাজে তা পেরে উঠি না। আমার শরীর অবশ, বিষণ্ণ এখন তুমিই আমাকে চালাও, আমাকে সাহস দাও। লীলা তুমি আমার সত্য সত্যই বোন্।” বিমলা এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিল, লীলাও শোকবিহ্বলা বিমলার শীর্ণ দেহ আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

আট

দিন কয়েক পরে সীমাচল বেড়াইয়া আসিয়া বিমলা মনে মনে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতেছিল। সে যতদিন ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিয়াছে ততদিন তাহাকে বড় নিঃসহায় বলিয়া মনে

হইয়াছে, দেয়ালঘেরা ঘরের মধ্যে প্রদীপের রশ্মির মত তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, তাহার প্রেম-প্রীতি যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, আপনার জনের সুখ শান্তি বিধানের দ্বারা তাহার মনে এত দিন যে তৃপ্তি ছিল, কাল-স্রোতে তাহা ভাসিয়া যাওয়ার পর, আজ সে আপনাকে যেরূপভাবে বুঝিবার অবসর পাইয়াছে আগে সে এমন করিয়া পায় নাই। অনভ্যস্ত ভ্রমণ ক্লেশে ক্লান্ত দেহে সে দিন সে ঘরের মধ্যে শুইয়া শুইয়া জীবনের নানা কথার আলোচনা করিতেছিল। বাহিরের বারান্দায় বসিয়া দুই বৃদ্ধ তখন পরলোক-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। লীলা একটা কৌচের উপর বসিয়া তাঁহাদের সে কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। বরদাবাবু কহিলেন,—"নরেন বাবু জীবনের শেষ যে এখানে নয়, পরলোক বলে যে একটা জিনিষ আছে,—এটা না মেনে উপায় নেই। জগদীশ্বরের সৃষ্ট সামান্য বারি বিন্দুর ভিতরেও দেখুন কতশত প্রাণী কিল বিল কচ্চে, আর এই অনন্ত লোক অনন্ত মণ্ডল কি জীব বিহীন?"

নরেন বাবু কহিলেন—"তাত নয়ই, তবে সেটা অনুভব কর্‌বার শক্তি আমাদের কোথায়? দেহের সঙ্গে সঙ্গেই যে সব লোপ হয়ে যায় না তা কে বল্‌তে পারে?" বরদা বাবু বাধা দিয়া কহিলেন—"আপনি একি বল্‌ছেন,—আত্মা অবিনশ্বর, দেহের ধ্বংসেই আত্মার ধ্বংস হয় না,—আত্মার অস্তিত্ব কি করে অস্বীকার কর্‌বেন। আজকাল আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব হৈ চৈ

হচ্ছে, আর আমি এ বিষয়ে অনেক পুঁথি পত্রও দেখেছি, জানেন মৃত ব্যক্তির ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তারা তুলেছেন ?”

“আমেরিকার কথা ছেড়ে দিন, আমাদের দেশের কথা বলুন না, দুরের দৃষ্টান্ত থেকে ঘরের দৃষ্টান্ত যে অনেকটা মনের উপর বিশ্বাসের ছাপ বসিয়ে দেয়।”

আত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ কথা বা সমালোচনা বরদা বাবু সহিতে পারিতেন না। বিলাত ও আমেরিকার যে সব কাগজে এ সব পারলৌকিক ব্যাপারের আলোচনা হইত, তিনি সযত্নে সে সকল কাগজগুলি পড়িতেন ও সে সকলের গ্রাহক ছিলেন, এ সব ব্যাপারে তাঁহার বেশ অভিজ্ঞতা আছে, সে দর্পও যে মনে মনে একটু না ছিল তাহা নহে। কাজেই তর্ক আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বাধা পাইয়া তাঁহার তর্কের নেশাটা একটু বাড়িয়া চলিল। জীবনের শেষ দিন যত ঘনাইয়া আসে, মানুষের এ সব আলোচনাও তত প্রীতিপ্রদ হয়, কাজেই দুই বৃদ্ধের পরস্পারের মত বিরুদ্ধ তর্ক ও বেশ জমিয়া আসিতেছিল।

লীলার কাছে তর্কটা তেমন ভাল লাগিল না, সে ধীরে ধীরে বারেন্দা হইতে নামিয়া খানিকক্ষণ বাগানে বেড়াইতে লাগিল। অমর ও বেলা সেদিনকার মত লেখা পড়া সাঙ্গ করিয়া বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছে। সুন্দর ক্ষুদ্র বাগানটি গোলাপ, বেল, যুঁই, টগর, মল্লিকা, ডালিয়া, দেশী বিদেশী সব জাতির ফুলগুলিই ফুটিয়া

বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। কয়েক দিন আগে বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় সবই যেন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, সবই যেন আনন্দ পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার তখনও অনেক বাকী, গোলাপী রঙ্গের মেঘগুলি সারা আকাশ খানি ছাইয়া ফেলিয়াছে।

লীলার মন আজ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের শোভারাশি যেন আকুল আবেশে তাহাকে আহ্বান করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চলিল। আজ সমুদ্র শান্ত সুবোধ শিশুর মত ধীরে ধীরে দুলিতেছিল। ধীবরদের নৌকা-গুলি সাগরের চঞ্চল তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে,—কতকগুলি ছেলে মেয়ে তীরে দাঁড়াইয়া খেলা করিতেছে কেহ বা উবু হইয়া বসিয়া শঙ্খ, ঝিনুক কুড়াইতেছে। খানিকটা দূরে একদল স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে! ভয়ে ভয়ে তাহারা দৃঢ়ভাবে মাটি আকড়াইয়া ধরিয়া ঢেউ লইতেছে। অনেকে এখানে সকালে বিকালে সমুদ্র স্নান করে। লীলা হাটিতে হাটিতে সেই দিকে গেল, উহারা যে সকলেই তাহার পরিচিত। তাহাদের পাশের বাড়ীর নবাগত ডাঃ বসুর পরিবারের মেয়েরা। লীলাকে দেখিতে পাইয়া স্নাননিরতা রমণীগণের মধ্যে একটা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল! লীলার ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া অমনি করিয়া সমুদ্রের ঢেউ লইবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। মেয়েরা ও দলের লোক বাড়াইবার জন্য তাহাকে টানিয়া লইল, সে কোন আপত্তি

না করিয়া তাহাদের দলে মিশিয়া গেল। "এই ঢেউ আসিতেছে— এই আসিল, সাবধান! যাঃ চলে গেছে! বাঃ বড় মজা ভাই! কি বলিস্!" ডাঃ বসুর মেয়ে নীরজা ত আনন্দে অধীর, লীলাকে পাইয়া তাহার উৎসাহটা খুব বাড়িয়া গেল। দূর হইতে পুরুষেরা তাহাদিগকে বাড়ী ফিরাইবার জন্য আহ্বান করিতেছিলেন! "এই যাচ্ছি! এই যাচ্ছি!" বলিয়া কেবলি পুরুষদিগকে মিথ্যা আশ্বস্ত বাণীতে নিরস্ত করিয়া তাহারা মনের আনন্দে লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া সমুদ্র স্নানের সাধ মিটাইতে ছিল। বন্দিনী নারীর দল একবার যদি পায়ের নিগড় খুলিয়া তীর্থ স্থানে যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের চঞ্চলতা ও পদদ্বয়ের লঘুতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তখন মনে হয় কে বলে ইহারা অবলা? সহরের কঠিন দেয়ালঘেরা ঘর ছাড়িয়া মহিলারা যখন একবার বাহিরে পদার্পণ করেন, তখন তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তীব্র কটাক্ষ! রোষভাষ! বাধ্য হইয়াই চুপ্ করিয়া নতশিরে মানিয়া লইতে হয়।

সাগরের জলে স্নান করিবার উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে সাহস বাড়িয়া গেলে তখন কি আর ধরিয়া রাখা যায়? লীলা আগে দুই একদিন মাত্র স্নান করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলের সঙ্গে সে কতকটা অধীনতার সহিত। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত, দুই একটা ঢেউ লইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহস বাড়িয়া গেলে সে আর চুপ

করিয়া মাটি ধরিয়া বসিয়া থাকিতে আরাম অনুভব করিল না, ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও নাচিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল! নীরজার সেই সবে প্রথমদিন সমুদ্রে স্নান; তাহার ততটা সাহসে কুলাইতেছিল না, সে দূরে দাঁড়াইয়া লীলার এই সাহসিকতার তামাসা দেখিতেছিল আর অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছিল।

সূর্য্য ডুবু ডুবু;—সমুদ্রের রক্ত রাঙ্গা ঢেউগুলি উন্মত্ত আনন্দে নৃত্য করিতেছিল! পুরুষদের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃই কর্কশ হইয়া উঠিতেছিল, মেয়েরা অনেকেই পারে চলিয়া গিয়াছে, শুধু লীলা আর একটা ঢেউ লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আর নীরজা তাহার অপেক্ষায় দূরে দাঁড়াইয়া আছে। আজ তাহার ঢেউ লইবার সাধ যে কেন হইল? তাহার ধীর স্থির চরিত্রের মধ্যে বালিকার চঞ্চলতা কেন আসিল, সে কথা কে বলিবে? ওই খুব বড় একটা ঢেউ দেখা যাইতেছে। রণবিজয়ী বীরের মত সে গর্জ্জন করিতে করিতে ফুলিয়া আসিতেছে; সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও প্রবল জোরে বহিতেছে। অনেক দূর হইতেই এই ঢেউটি দেখা যাইতেছিল, লীলার এই ঢেউয়ের তালে তালে একবার নাচিবার সাধ চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই যে ঢেউ আসিল। লীলা ও ঢেউয়ের বুকে ভাসিয়া উঠিল! কিন্তু একি! কোনরূপেই যে ঢেউকে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিল না! এই যে ভাসিয়া উঠিল, এই যে ডুবিতে চলিল! সঙ্গীর দল চেঁচাইয়া উঠিল, কিন্তু

কেহই সাহস করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল না! দূর হইতে একজন সান্ধ্যভ্রমণকারী যুবক এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন সূর্য্য সমুদ্রের অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে। অন্ধকার আবরণে পৃথিবী ঢাকা পড়িয়াছে।

নয়

পিতার মৃত্যুর পর বিজয়ের কাছে সংসারের কোন আকর্ষণই আর রহিল না। বাড়ীখানি, গ্রামখানি সকলই যেন শূন্য বোধ হইতে লাগিল। পিসীমা দিন রাত কাঁদিয়া অস্থির করিতে লাগিলেন, "হায়! বাছা আমার কাব মুখ চাহিবে?" আর সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর প্রতি এমনি সব কটু ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন যে এত জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে সে সব প্রকৃতই অসহ্য হইয়া উঠিল। অসহ্য হইলেই বা কি হইবে? তাহার ত সে সব অভিযোগের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া জোর করিয়া কোন কথা কহিবার নাই। সে কি বলিবে? যে সত্য কঠোর দণ্ডের মত তাহাকে আঘাত করিয়াছে, ধনী শ্বশুর তাহাকে ভিখারী জ্ঞানে যে অপমান করিয়াছে, অর্থের প্রলোভনে তাহাকে প্রলোভিত করিবার কি অদম্য প্রয়াস! আর স্ত্রী—শাস্ত্রে যাহাকে বলে অর্দ্ধাঙ্গিনী, নারায়ণ সাক্ষী করিয়া সে যাহাকে গ্রহণ করিয়াছে—

এই তাহার ব্যবহার? এই তাহার আচরণ? এই বিপদের সময়ে কই সে ত একখানা চিঠিও লিখিল না। যাক্ তার ও ভাবনা ভাবিবার আবশ্যক কি? পিতৃ আদেশ—পিতার মৃত্যুশয্যায় পিতার চরণ ছুঁইয়া সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে তাহা রাখিবেই। আর তার ত কোন অপরাধই নাই, সেত কোন অপরাধ করে নাই, কোন অন্যায় করে নাই, সে যে কর্ত্তব্যকে কোন দিন লঙ্ঘন করে নাই, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সে তাহার স্বামীর কর্ত্তব্য রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সান্ত্বনার ছলে যখন গ্রাম্য নর নারীর দল নানা কথার অবতারণা করিয়া তাহার বড়লোক শ্বশুরের ও সঙ্গে সঙ্গে বধুর কথা তুলিয়া নিন্দা করিত এবং তাহার পিতার অশান্তি ও দুঃখের অবতারণা করিতে থাকিত, তখন তাহার হৃদয় কি যে অপমানে, কি যে ক্ষোভে, কি যে মর্ম্মন্তুদ যাতনায় দগ্ধ হইত সে যে প্রকাশ করিবারও যো নাই! ক্রমে পল্লীজননীর শান্ত শীতল ক্রোড় তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল! এতদিনে সে বন্ধন-মুক্ত! এতদিনে জগতের সকল আকর্ষণ, সকল আনন্দ অভিনন্দন হইতে তাহাকে যে কাল দূরে ফেলিয়া দিয়াছে।

পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য শেষ হইল। পিসীমা খালি ভিটায় পড়িয়া থাকিতে আর চাহিলেন না, চিরদিনের জন্য কাশীবাসে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বিজয়কে কহিলেন—'বাবা! আজ যদি তোর বৌ আস্‌ত, তা হলে কি আর আমি যেতে পাত্তুম, এখন যে

আর মন উঠছে না বাবা! আমি এ শূন্যপুরী আর পাহারা দিতে পারবো না! আর কটা দিনই বা আছি?'

বিজয় পিসীমাকে প্রণাম করিতে যাইয়া কহিল 'পিসী মা! আশীর্ব্বাদ করো যেন বাবার শেষ আদেশ রক্ষা কর্‌তে পারি।'

পিসীমা মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিলেন; কহিলেন, 'বাবা। তোর এ বয়সে এত কষ্টও ছিলরে। আজ যে তুই বড় অনাথ! তোকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না, কিন্তু থাকৃতেও আর সাধ নেই, তুইত আর বাড়ীতে বসে থাকৃবি না, আমি কি করে দিন কাটাব?' তিনি চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ ভৃত্য রামতনু সেই বাড়ী আগ্‌লাইয়া পড়িয়া রহিল। সে কোথাও যাইতে চাহিল না। বিজয় তাহাকেও কাশী পাঠাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু বৃদ্ধ হাসিয়া কহিল, 'সাতপুরুষের ভিটা মাটি ছেড়ে আমি কোথা যাব?"

মানুষের মন কত দুর্ব্বল, কত চঞ্চল! পাছে হৃদয়ে কোন দুর্ব্বলতা আসে আর দেশের লোকজনের নানাবিধ তিক্ত সমালোচনায় তাহাকে জ্ঞানভ্রষ্ট করে তাই সে একদিন অশ্রুভরা চক্ষে দেশের মাটি ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল—আবার তাহার বন্ধুদলে যাইয়া মিশিল। কিন্তু সে প্রীতির নীড় ত আর চিরস্থায়ী নহে—দুই বৎসরের মধ্যেই উহা ভাঙ্গিয়া গেল। যার যার পরীক্ষা শেষে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইল। বিজয়ও ওকালতি ব্যবসার জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে দেশ পর্য্যটনে বাহির হইবার

উদ্যোগ করিল। বাঙ্গালার কোন জেলাই তাহার মনঃপুত হইল না—না হইবার কারণও আছে, পাছে বাঙ্গালার মাটিতে থাকিতে গেলে কোনরূপে তাহার শ্বশুরের সংস্রবে আসিতে হয়, পাছে তাহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে হয়—এই আশঙ্কায়ই সে দেশ ছাড়িয়া পলাইল,—সংকল্প করিল এমন দূরে যাইয়া সে তাহার নীড় বাঁধিবে যেখানে কোনরূপেই বাঙ্গালার মাটির হাওয়া গায়ে লাগিবে না—কাহারও সঙ্গে কোন সংস্রব থাকিবে না। নিঃসঙ্গ বিদীর্ণ বক্ষ পর্ব্বতশৃঙ্গের মত সে একা, সব আঘাত সব যন্ত্রণা, সব ঝঞ্ঝা নীরবে সহ্য করিবে। শত বজ্রাঘাত, শত ব্যথা—যন্ত্রণা—সব সে সহিবেই। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তাহার এই বিদেশ যাত্রা। এই দুই বৎসর সে শিক্ষকতা করিয়া ওকালতি পড়িয়াছে, শ্বশুর আর তাহার কোন সন্ধানই নেন নাই,—সে যাহা চাহিয়াছিল তাহাই পাইয়াছে—তাহাকে আর কোনরূপ আকর্ষণে আকর্ষিত হইতে হয় নাই। কমলাত তাহার সম্পর্কে পূর্ব্বাপরই উদাসীন। তখন যে তাহার ঔদাসীন্যই অধিকতর বরণীয়, কাজেই তাহার হৃদয় এ দু'বৎসরে অনেকটা কঠোর ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বিজয় ওকালতির জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিতে বাহির হইয়া ধূমকেতুর মত কেবলি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোন সহরে দু'দিন, কোন সহরে চারিদিন, এমনি করিয়া সে ঘুরিতে লাগিল। ভ্রমণের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, একবার বেড়াইবার ঝোঁক

চাপিলে সে আর কোনরূপেই না ঘুরিয়া থাকিতে পারে না কেবলি ঘুরিতে চাহে—কেবলি দেশদেশান্তরে ঘুরিতে থাকে, নানাস্থানে নানা সৌন্দর্য্য 'তখন একবার আমাকে দেখ একবার আমাকে দেখ' বলিয়া সবলে আকর্ষণ করে। বিজয়েরও এমনি করিয়া ভ্রমণের খেয়াল চাপিয়া গেল, সেও নানাদেশ নানাস্থান ঘুরিতে লাগিল, ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে ওয়ালটেয়ারে যাইয়া পঁহুছিল।

ওয়ালটেয়ারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাহাকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিল। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে ভ্রমণ তাহাকে বড়ই তৃপ্তিদান করিত। একদিন অপরাহ্ণে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল যে একজন স্নানার্থিনী রমণী সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া চলিতেছে—দূরে ও নিকটে অনেক লোক আছে কিন্তু কেহই সে দিকে লক্ষ্য করিতেছে না, কিংবা তাহার উদ্ধারের জন্য কেহই উদ্যোগী নহে—শুধু জনকয়েক স্ত্রীলোক চীৎকার করিতেছে। বিজয়ের এই দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কি? এমন করিয়া একজন অসাহায় রমণী সমুদ্রে ডুবিয়া মরিবে। পরের উপকারের জন্য জীবন গেলই বা! সে তাড়াতাড়ি সমুদ্রের সেই তরঙ্গ লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দশ

অকূল সমুদ্রের সুদূর প্রান্ত হইতে ধীবরেরা নৌকা লইয়া যখন তীরে ফিরিয়াছে, তখন রাত্রি অনেক ; চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু কৃষ্ণ-পক্ষের দ্বাদশী তিথির ম্লান চন্দ্র অজস্র জ্যোছনা ঢালিয়া দিয়াছে, তরল রজতধারায় চারিদিক প্লাবিত। একজন ধীবর "ডলফিন নোজের" ধারে নৌকা লাগাইয়া তীরে নামিয়া দেখিতে পাইল, ঠিক তাহারি নৌকার পাশে দুইটি মৃতদেহ পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনা-বদ্ধাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। শুভ্র-জ্যোৎস্নালোকে সিকতা-শয্যায় অনন্ত নীল সমুদ্রতীরে দুইটী মৃতদেহ, একজন পুরুষ, অপর রমণী। নিঃসহায়া নারী যেন বড় আবেগে দৃঢ় দেহ বলিষ্ঠ পুরুষের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছিল। তারপর কেহই বোধ হয় তরঙ্গাঘাতে আপনাকে স্থির রাখিতে পারে নাই, দুইজনেই অনন্তের বুকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ভাসিয়া চলিয়াছিল, তারপর সমুদ্র তাহাদিগের জীবনের শেষ প্রদীপটুকু তরঙ্গাঘাতে নিভাইয়া দিয়া কূলে অসহায়া ধরিত্রী-জননীর কোলে তাহারি সন্তান দুটীকে ফিরিয়া দিয়াছে। ধীবর বৃদ্ধ, কিন্তু শক্তিহীন নহে, সে ধীরে ধীরে বালির উপর উবু হইয়া বসিয়া উভয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, দেহ দু'টী তখনও উষ্ণ, তারপর সঙ্গীদের সকলকে ডাকিয়া একত্র উভয়কে বহন করিয়া সহরের দিকে লইয়া চলিল।

এদিকে লীলার সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিয়া যাওয়ার ও একজন যুবকের তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার খবর যখন নরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিল—তখন সেখানে শোকের ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠিল। সকলেই হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে লোকজন প্রেরিত হইল। প্রবাসী সকল বাঙ্গালী পরামর্শ করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বরদা বাবু স্থির, নিশ্চল, উদ্বেগ বিরহিত। তিনি শান্ত, অচঞ্চল! নরেন বাবুকে কহিলেন, "আজ লীলা তার মায়ের সঙ্গ লাভ করেছে! দেখুন, আমার হৃদয়ে আঘাত পেয়েছি বটে, কিন্তু তাকে যে আমি হারাই নাই, সে যে আমার আছে, সে সান্ত্বনাও আমার রয়েছে। বিধাতা মানুষকে কখন কি ভাবে কোলে টেনে নেন, সেটা আমরা কোন রকমেই বুঝে উঠ্‌তে পারিনে।"

এই বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে ডাঃ বসুর পরিবারের একজন যুবককে লইয়া বরদা বাবু সমুদ্র-তীরের পথ ধরিয়া খুঁজিতে বাহির হইলেন। নরেন বাবু বারেন্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। বিমলা কাঁদিতেছিল, লীলার এইরূপ আকস্মিক বিপদ-সংবাদে তাহার নারী-হৃদয় আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে যে লীলাকে সহোদরাধিক ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, সে যে তাহাকে বড় আপনার করিয়া লইয়াছিল। হায়! সে যাহাকে ভালবাসিবে তাহাকেই কি বিধাতা জোর করিয়া ছিনাইয়া লইবেন?

অন্ধকার ঘুচিয়া আকাশে জ্যোছনা উঠিল, তবু নরেন বাবু বাহিরের চেয়ারে নিশ্চল ছবির মত বসিয়া রহিয়াছেন, কোন কথা নাই; আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ; আকাশে কত কোটী তারা জ্বলিতেছে, কোথায় তাহার শেষ, কি তাহারা? কে তাহাদের সৃষ্টি করিল? কি বিশাল ওই অনন্ত গগন, কোটি কোটি সূর্য্য, কোটি কোটি সৌরজগৎ ঘুরিতেছে—কোটি কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি নব সৃষ্টি, কে সৃষ্টি করিল? মৃত্যুর পরে কি অমনি এক সুদূর নক্ষত্রের বুকে তাহাদের আশ্রয়? আজ যে লীলা ফুটন্ত মল্লিকার মতো যৌবনের প্রথম উন্মেষে ঝরিয়া পড়িল, সেও কি ঐ সুদূর দিগন্তে নিলীন কোন এক উজ্জ্বল গ্রহ-বক্ষে নূতন জ্যোতির্ম্ময়ী দেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে? কে তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি। কে তুমি জগত সৃষ্টিকারক, কে তুমি অনন্ত লোকেশ্বর! বল—বল—বলিয়া দাও! কিসের এ জীবন, কেন এ জীবন, কোথায় ইহার পরিণতি, কোথায় ইহার শেষ!

স্তব্ধ রজনী; জ্যোছনা হাসিতেছে, গির্জ্জার উচ্চচূড়ে মণি ঠিকরিয়া পড়িতেছে, চঞ্চল বাতাসের করস্পর্শে মাঝে মাঝে নাচিতেছে, দুলিতেছে! সাগরের অশ্রান্ত কলরব! তোমার আমার শোকে দুঃখে, ব্যথা বেদনায় প্রকৃতির কি? তাহার কিসের ব্যথা, কিসের বিষাদ? ধ্যানমগ্ন নরেন্দ্র বাবু ব্যথিত-চিত্তে ভাব-বিভোর! এমন সময়ে বরদা বাবুর বিকট চীৎকারে হঠাৎ উঠিয়া

চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইলেন সম্মুখে বরদা বাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

নরেন্দ্র বাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, বরদা বাবু কেমন করিয়া পথে ধীবরদের নিকট লীলা ও তাহার উদ্ধারকারী যুবকের দেহ পাইলেন, সে সব বলিলেন, এক নিমেষে সব কথা শেষ করিয়া কহিলেন, "চলুন! আপনি আসুন, একবার তাহাদের দেখুন, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তারা দুজনেই প্রাণ ফিরে পায়। দেখুন, আমি পিতা, অকপটে বল্‌ছি, যদি লীলাকে হারাই, আমি একটুও দুঃখিত হব না, কিন্তু সেই অপরিচিত যুবক যেন বেঁচে ওঠে, এমন জীবন যে জগতের বড় আদরের—লক্ষ লক্ষ লোকের কামনার জিনিষ!" নরেন বাবু ও বরদা বাবু লীলার নির্দ্দিষ্ট বাংলাতে আসিলেন। লীলার শুইবার ঘরে তাহাকে লইয়া বাইয়া জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা হইতেছে, আর বসিবার ঘরে যুবকের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাঃ বসু এবং স্থানীয় দুইজন ডাক্তার, কয়েকজন ভদ্রলোক, এবং মহিলারা উভয়ের সেবায় মন নিবেশ করিয়াছেন। যাঁহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে চলিয়া গেলেন, শুধু শুশ্রূষাকারীর দল দুই কক্ষে থাকিয়া উভয়ের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদা বাবু বাহিরের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ প্রশান্ত গম্ভীর, নরেন বাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেলেন। বিমলা তখন

ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারগণ উভয়ের জীবন সম্পর্কেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; বহুক্ষণ চেষ্টার পর ডাঃ বসু হাসিমুখে আসিয়া বরদা বাবুকে কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে পারেন, উভয়ের ভিতরেই জীবনের লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। আর কোন ভয় নেই, ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই দুজনের জ্ঞানের সঞ্চার হবে, কোন ভয় নেই।" বরদা বাবু গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন, "দয়াময় তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আপনাদের শ্রম সার্থক হউক" এরূপ সময়ে একজন ডাক্তার আসিয়া কহিলেন, "ডাঃ বসু, মিস্ রায় চোখ মেলে চাইছেন।" ডাক্তার বসু প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, "আচ্ছা বেশ! আমি যাচ্ছি।" আর একজন আসিয়া কহিলেন, "অপরিচিত যুবকটীর শ্বাস প্রশ্বাস বইছে, তারও শীঘ্রই জ্ঞান হবে বলে মনে হয়।"

ডাঃ বসু—"বেশত! আপনারা খুব উৎসাহের সহিত কাজ করুন।" তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ডাঃ বসুর ম্লানমুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

লীলার ভতক্ষণে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। সে চোখ মেলিয়া দেখিল তাহারি পরিচিত কক্ষ! সেই সুন্দর ক্ষুদ্র কক্ষখানি! তাহারি পরিচিত মুখ—ডাঃ বসু ও নীরজা তাহার বিছানার পাশে বসিয়া আছেন, আর একটু দূরে মূর্ত্তিমান বিষাদচ্ছবি বরদা বাবু দাঁড়াইয়া আছেন, আনন্দে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। লীলা আবার চোখ বুজিয়া ফেলিল, ঘটনাটা সে যেন ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ক্রমশঃ তাহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিতে

লাগিল, সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ব্বলতার জন্য তাহার চক্ষু ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল, সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিলে চোখ মেলিয়া দেখিল, সে একা শুইয়া আছে, আর একখানা আরাম কেদারায় তাহার পিতা বসিয়া আছেন। লীলা নয়ন মেলিতেই বরদা বাবু বলিলেন, "মা!"—লীলা কহিল, "বাবা।"

বরদা বাবু কহিলেন, "তোমার শরীর কেমন, ভাল ত?

"হ্যাঁ, বাবা! বাবা—"

"কি মা!"

"তিনি কি রক্ষা পেয়েছেন? সেই যিনি আমাকে উদ্ধার কর্ল্লেন, যিনি আমাকে বাঁচালেন?"

"হ্যাঁ মা।"

"কোথায় তিনি?"

"এ বাড়ীতেই আছেন, তাঁরও খানিকক্ষণ হল জ্ঞান হয়েছে। এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, তুমি আর কথা বলোনা মা চুপ করে থাক! বিমলা ভোরে এসে তোমায় দেখে গেছে, আবার দুপুরে আস্‌বে!

লীলা আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু বুঝিল। বরদা বাবু একজন দাসীকে সে কক্ষে রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বিজয়ের জ্ঞান হইলে দেখিল, সে একটী সুন্দর কক্ষে শুইয়া আছে। তাহার সাম্‌নে একখানা চেয়ারে একজন চিকিৎসক বসিয়া

আছেন। তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। বিজয়ের সব যেন স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল। স্ফটিক-শুভ্র সমুদ্রের অতলতলে পাতাল রাজ বাসুকীর মণিমাণিক্য-খচিত সুন্দর পুরীতে সে, আর কে যেন একজন রমণী মনের আনন্দে বেড়াইতেছিল, পুষ্পিতালতার মত তাহার সৌন্দর্য্য, বাসন্তী জ্যোছনার মত তার অঙ্গের বরণ, বড় সুন্দরী—বড় রূপসী সে রমণী, কি সুন্দর সে দেশ! ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলসমুদ্র চন্দ্রাতপ, নিম্নে সুবিস্তৃত বিরাট প্রাসাদ, কিন্নরীরা সেখানে গান গায়, মৎস্যকুমারীরা আনন্দে নাচিয়া বেড়ায়। কোন দুঃখ দৈন্য সেথায় নাই, বড় সুন্দর কাব্যময় সে দেশ। সে দেশ ছাড়িয়া কোথায় সে আসিয়াছে। ভাল করিয়া কোন কথাই যে তাহার মনে হইতেছে না। ধীরে ধীরে সে চক্ষু বুজিল।

বর্ষার শেষে শরতের সুন্দর প্রভাত। পাখীর কূজনে দিগন্ত মুখরিত। নানাজাতীয় পুষ্পরাজি বিকশিত। চারিদিকে রূপের লহরী, চারিদিকে মাধুরী—চারিদিকে সুষমা। ডাক্তার দুইজন সারারাত্রি জাগিয়া রজতকাঞ্চন পুরস্কারে পকেট পূরিয়া ক্লান্তদেহে ঘরে চলিয়া গিয়াছে। ডাঃ বসু বাসায় ফিরিয়া গিয়াছেন, বরদা বাবু নিশ্চিন্ত মনে নরেন্দ্র বাবুর সহিত আগেরি দিনের মত পরলোকতত্ত্বের আলোচনা ছাড়িয়া বিধাতার মহিমা আলোচনা করিতেছেন। দুইজন সেবক নিশ্চিন্ত অবসর পাইয়া আরামে বারেন্দায় আরাম-

কেদারার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এ পরিবারসংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে ও প্রতিবেশী সকলের মধ্যে এখন একটা অনাবিল শান্তির ভাব বিরাজমান।

বিজয়ের যখন বেশ জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল, সে একা, আগেরি মত শয্যায় শুইয়া আছে, একপাশে একটী ছোট ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছে। রৌদ্রের স্বর্ণধারা মুক্ত জানালা পথে ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরে আর কেহই নাই। ধীরে ধীরে সে শয্যা ছাড়িল, শরীর দুর্ব্বল, তথাপি সে দাঁড়াইতে পারে। সে কোথায়, কিরূপে আসিল? এ কাহার বাড়ী, কাহার ঘর, কাহার জন্য সে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল—সব মনে পড়ে অথচ সবই যে পরিস্ফুট, তাহা নহে; ধীরে ধীরে অতি ধীরে সে শয্যা হইতে অবতরণ করিল। কোথায় সে যাইবে? ঐ পাশের ঘরের দরজাটা একটু খোলা। ঘরে কে আছে? সে জানে না. ধীরে ধীরে সে পাশের ঘরের দরোজাটা একটু আঘাত করিল, কই কোন শব্দ নাই, কেহ কোন কথা বলিল না? সে আস্তে আস্তে দরজাটা একেবারে খুলিয়া ফেলিল! কে এ রমণী? একখানা কোচের উপরে লীলা ঘুমাইয়া রহিয়াছে। একখানা সূক্ষ্ম গাত্রাবরণী দিয়া তাহার দেহ আবৃত। দুই পাশে কালো চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, প্রফুল্ল শতদলের মত সেই মুখখানি, গোলাপের অস্ফুট কলির মত নয়নযুগল মুদিত, মল্লিকাফুলের মত

একখানা সাদা ধবধবে হাত স্পন্দিত হইতেছে। কি রূপ। কি সৌন্দর্য্য! এমন রূপ বুঝি বিজয় আর কখনো দেখে নাই, সে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল—জ্ঞানহীন আড়ষ্টের মত চাহিয়া রহিল—সব ভুলিয়া সে সৌন্দর্য্য-বিভোর-নয়নে সেই নিদ্রিতা রূপসীর দিকে চাহিয়া রহিল। সে যে নয়ন ফিরাইতে পারেনা। বুদ্ধিবল, সাহসবল—সব যেন তাহার লোপ পাইয়াছে, নির্জ্জন গৃহে এমন রূপ দেখিয়া কে নয়ন ফিরাইতে পারে বল? দুর্ব্বল ক্লান্তদেহের হৃদ্‌পিণ্ড দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। যদি সে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া পাইত, যদি তখন তাহার মস্তিষ্ক সবল থাকিত তাহা হইলে এমন ভাবে সে কখনো চাহিয়া থাকিতে পারিত না। এমন নির্লজ্জ বেহায়ার মত সে কখনো নির্জ্জন কক্ষে দাঁড়াইয়া রমণীর রূপলহরী দেখিতে পারিত না। এ ত রূপ নয় এ যে প্রলয় অগ্নি। এ অগ্নিতে যে জগৎ ভস্ম হয়; দেবতা জ্ঞানভ্রষ্ট হয়, তুমি আমি কোন ছার! এ ত শুভ্র শীতল শান্ত শতদল নয়—এ যে বিদ্যুৎভরা মেঘের মত—ব্রহ্মাগ্নির মত—খাণ্ডবদাহনকারী অগ্নির মত অতি ভীষণ প্রলয়ঙ্করী। ধীরে নীরবে বাতাস বহিতেছিল,—ধীরে নীরবে লীলা ঘুমাইতেছিল, আর ধীরে নীরবে বিজয় তন্ময় হইয়া তাহাকে দেখিতেছিল। মাঝে শুধু ক্ষণিকের জন্য তাহার বিবেকবুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে বড় ক্ষণিক জলবুদ্বুদের মত; এমন সময় লীলা নয়ন মেলিয়া চাহিল—চোখে চোখে বিদ্যুৎলহরী খেলিয়া গেল।

এগার।

লীলা কলিকাতা হইতে ওয়ালটেয়ার চলিয়া আসিলে, অমলের কাছে কলিকাতা সহরের সকল সৌন্দর্য্য যেন নিমেষ মধ্যে মুছিয়া গেল! গাড়ীর ঘর্ ঘর্ শব্দ, দিনরাত্র লোকজনের কোলাহল, এমন জায়গায় কি মানুষ থাকে? বন্ধুজনের প্রীতিসম্ভাষণও তাহার আর তেমন ভাল লাগিত না; অরুণার সঙ্গে মিশিবার জন্য সে বড় একটা উৎসুক ছিল না, আর মিশিবার তেমন সুযোগও হইত না, অরুণা যে ব্রাহ্মভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিত তিনি মেয়েদের বাহিরের লোকজনের সহিত মেলা মেশাটা তত বেশী পছন্দ করিতেন না, নেহাৎ কার্ড পাঠাইয়া অনুমতি লইয়া সেই বৃদ্ধের উপস্থিতিতে সরল সহজভাবে কোন কথারই আলোচনা হইতে পারিত না। এজন্য অরুণা রুদ্ধ রোষে ফুলিয়া উঠিত, আর অমল অরুণার নিকট হইতে লীলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য দুই একবার যাইয়াই নিজকে অপমানিত মনে করিয়া সেখানে যাওয়া একেবারে ক্ষান্ত করিয়া দিল; কাজেই অরুণার কোন উদ্দেশ্যই ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। অমল—লীলার নিকট হইতে কোন দিন কোন বাক্যে কিংবা ব্যবহারে প্রণয়ের সামান্য অভাব না পাইলেও লীলা কলিকাতায় আছে, ঐ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীটাতে তার জীবন বসন্তের প্রথম প্রণয়-পারিজাত পুষ্পটি

ফুটিয়া রহিয়াছে, এ বিশ্বাসটা তাহার প্রাণে যে একটা আশার কুঞ্জ রচনা করিয়া দিত এখন আর তাহা নাই। সেখানে নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। সে বাড়ীর মেয়েদের সাড়ীগুলো ছাতের উপর হইতে রাস্তার ধারে দুপুর বেলা ঝুলিতে থাকে, কক্ষের জানালাগুলো হাওয়ায় দোলাদুলি করে—এ দৃশ্যটা প্রতিনিয়ত দেখিয়াই তার আনন্দ। কে যেন একটা আকর্ষণে তাহাকে ঐ বাড়ীর পথ দিয়া লইয়া যায়, সে জানে—যাহার দর্শন লালসায় তাহার চিত্ত ব্যাকুল—সে ওখানে নাই, তবু—তবু সে ঐ পথটার আকর্ষণ ছাড়িতে পারে না।

কয়েক মাস চলিয়া গেল,—আগের মত তাহার আর আমোদ প্রমোদ উল্লাস বিলাসে মন ভাল লাগে না, সে যেন দিন দিনই নূতন মানুষ হইতে চলিল। ইয়ার বন্ধুরাও একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিল, "কি জানি ভাই অমল কবে কৌপিন পরিয়া লোটা কম্বল লইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়ে," কেহ বা দুটা ছড়া কাটিয়া শ্লোক আওড়াইয়া তাহার এই কাপুরুষত্বের জন্য বিদ্রূপের তীব্রবাণ ছুড়িতে লাগিল। অমল কিন্তু কিছুতেই কোন কথা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া কহিল না। বাহিরের যে পিশাচমূর্ত্তি তাহাকে ভোগ-লালসার দিকে পরিচালিত করিয়া কেবলি পোড়াইয়া মারিয়াছে, সহসা তাহাতে কিসের এ শীতল চন্দন প্রলেপ! তাহার তপ্ত জীবনে এ মলয়ের মধুর বাতাস কোথা

হইতে আসিয়া চিত্ত পুলকিত করিয়া দিল! ভক্ত যেমন তাহার নিগূঢ় জপমন্ত্রটী কোন রকমেই বাহিরে প্রকাশ করিতে চাহে না, তেমনি অমল হৃদয়-মন্দিরে যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইয়াছে তাহার সেই আলোক-রশ্মি বাহিরের বাতাসে পাছে নিভিয়া যায় সে ভয়ে অতি সন্তর্পণে প্রতিনিয়ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে, বিলাসের তরল চঞ্চল-চিত্ত বন্ধুগণকে কোন কথা বলিয়া সে মধুর পুণ্য চিত্র পরিম্লান করিতে ত প্রাণ তাহার চাহে না।

কেন সে তাহাকে পাইবে না? ধ্যানে দেবতার আসন টলে,—আর প্রেমের মোহন-মন্ত্রে সে কি তাহার অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া পবিত্র ঋত্বিক বেশে পুণ্যমন্ত্রের উদ্বোধন-গীতে তাহার আরাধ্যা দেবীর চিত্তরাজ্য জয় করিতে পারিবে না? মন কহিল—নিশ্চয়ই পারিবে। আর যদি সে বাধা পায়ই—তবুত তাহার দেখিবার সাধ মিটিবে! না না—সে আর পারে না। জেলের কয়েদীর মত তাহার প্রাণ কলিকাতার পাষাণ প্রাচীর ঘেরা গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এ ইচ্ছা বুকে লইয়া সে একদিন ওয়ালটেয়ার চলিয়া গেল।

———

বার।

কয়েক দিনের মধ্যেই বিজয় ও লীলা তাহাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। পরের জন্য যে নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সমুদ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে সে যে সাধারণ মানুষ নয়—এটা খুবই ঠিক। ওয়ালটেয়ারের প্রবাসী বাঙ্গালীর দল বিজয়কে নানাভাবে তাহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ খবরের কাগজে তাহার ছবি পাঠাইয়া "বীর বাঙ্গালী যুবক" নামে প্রবন্ধ পাঠাইলেন, কয়েক দিন এই একটা অভিনব ব্যাপারে সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীর দল মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। বিজয়ের কাছে এ সকলটা যেন কেমন কেমন লাগিত। বাহিরের সমাজের সঙ্গে যে কোন দিন মেশে নাই, মেসের বাসার সামান্য অভিজ্ঞতাই যাহার জীবনের প্রথম সম্বল, শিক্ষিত উন্নত সমাজের সহিত যাহার মেলামেশার এই সবে প্রথম সুরু, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধন্যবাদের পুষ্পমালা ও বাহিরের এতটা বাড়াবাড়ি চলিলে সে যে কেমন হইয়া পড়ে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিজয় ইহাতে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে দিন বরদাবাবু যখন বিজয়ের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কহিলেন—"আপনি আপনার জীবনকে যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছেন,—আশীর্ব্বাদ করি সে ভাব চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ থেকে আপনার জীবনকে চির-

মধুময় করে তুলুক! আপনি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনে আমার প্রাণে যে শান্তি দিয়েছেন, তেমনি আপনার জীবন যেন চির শান্তিময় ও সুখময় হয়।” বৃদ্ধের এই কথাগুলির মধ্যে স্নেহের এমনি একটা করুণসুর বাজিতেছিল যে বিজয় কোন মতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, সে বরদাবাবুর চরণ ধুলি মাথায় লইয়া গদগদকণ্ঠে কহিল, “জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার আশীর্ব্বাদ যেন আমার জীবনে সফল হয়।”

প্রথম স্রোতের বেগটা কাটিয়া গেলে যখন বিশেষরূপে তাহার পরিচয় পাইবার জন্য সকলের মধ্যেই একটা উদ্বেগ চঞ্চলতা দেখা গেল—সকলেই বাহিরের দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন তাহার অন্তরের দ্বারে আঘাত করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহার সকল রকমের পরিচয়টা পাইবার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন সে চঞ্চল হইয়া উঠিল,—পরিচয়, কাহাকে সে তাহার পরিচয় দিতে যাইবে? সে ত সকলেরই পরিচয় পাইয়াছে, কিন্তু সে যদি নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া ধরা পড়ে, যদি ইহাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে যাহার সহিত রাধাকান্ত বাবুর পরিচয় আছে, তাহা হইলে যে বড় অন্যায় হইবে।

একদিন নরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে চায়ের আড্ডা বসিয়াছিল। সহরের প্রবাসী বাঙ্গালীরদল সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, লীলা ও নীরজা সেদিন সেই অল্প সংখ্যক অতিথির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল।

অন্দরে বিমলা পরমানন্দে আহার্য্য যোগাইতেছিল, এখন সে নানা কাজের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া প্রাণে অনেক শান্তি অনুভব করিতেছে। বিজয় একখানা ছোট টেবিলের পাশে বসিয়া অপলকে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়াছিল! এই শান্ত সুন্দর সুনীল সিন্ধুর বুকে মরণ বুঝি বাস্তবিকই বড় সুখের! বিজয়ের মেলামেশার মধ্যে সে একটা বেশ গাম্ভীর্য্য ও কেমন একটা দূরত্বের ভাব ছিল সেটা কিন্তু কাহারও লক্ষ্য ছাড়া হয় নাই; আর যুবকটীর খুঁটিনাটি পরিচয় চাহিলেই যে তাহার মুখ কেমন একটা বিবর্ণ শ্রী ধারণ করে তাহাও কিন্তু অনেকের চক্ষুই এড়ায় নাই। তথাপি সে তাহার পরিচয়টা এবং কর্ত্তব্যের কথাটা বলিতে কোন গোপনীয় ছদ্মবেশ অবলম্বন করে নাই—সে শুধু সেখানেই ক্ষান্ত দিয়াছিল, যেখান হইতে তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছে। বিজয়ের মন কেবলি এখান হইতে ছুটিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু চারিদিক হইতে স্ত্রী ও পুরুষের দল সকলে মিলিয়া যখন কৃতজ্ঞতাভরে তাহার ঐরূপ অন্যায় কল্পনাটার উপর কঠোর বজ্র তুলিয়া দাঁড়ায়, তখন সেও চুপ করিয়া হাত পা ছাড়িয়া দেয়, যে মনের জোরে সে আপনাকে সবলে কমলার নিকট হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, যে মনের বলে সে মুমূর্ষু পিতার চরণতলে বসিয়া বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ দূরে রাখিবার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে মনের জোরে সে এখানে চলিয়া আসিয়াছিল, ঠিক

এখানে তেমন মনের জোরে উন্নত কণ্ঠে সে "না" বলিতে পারে নাই ; কিন্তু বেশী দিনত আর এ ভাবে চলে না। আজ তাই একে একে সকলে চলিয়া গেলে বিজয় বরদা বাবুকে কহিল,—

"দেখুন কাল আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই, অনেক দিন হয়ে গেল! কি বলেন ?" লীলা বিজয়ের মুখের দিকে নয়ন দুটী ন্যস্ত করিয়া পিতার উত্তরের অপেক্ষায় ফিরিয়া চাহিল! তাহার বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল। বরদাবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া স্নেহগদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "তা আপনাকে আর কি করে ধরে রাখি বলুন! আপনার ঋণ আমি ও লীলা জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না, কি বলিস্ মা ?" লীলা মিনতির স্বরে কহিল,— "বিজয় বাবু, আপনাকে বাধা দিবার শক্তি ত আমাদের নেই" ; বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ যেন চাপিয়া আসিতেছিল,—সেই সমুদ্র তরঙ্গে ভাসিয়া যাওয়ার ভীষণ দৃশ্যটি, সেই বিজয়কে আশ্রয় গ্রহণ— সবই যেন তাহার চখের সাম্‌নে ছবির মত ফুটিয়া উঠিতেছিল,— "আপনি যখন যে ভাবে যেখানে থাক্‌বেন, আমাদের চিঠি লিখতে ভুলবেন না যেন!" বলিতে বলিতে লীলার স্বরটা যেন ধরিয়া আসিল।

বিজয় ধীরে মৃদুস্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই! আপনাদের অতুল্য স্নেহ আমি জীবনে কখনো ভুলতে পার্‌বো না, যে সেবা ও যত্ন করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন সে দেবতার কাজ! কাল ভোরের

গাড়ীতেই আমি ওয়ালটেয়ার ছাড়্ব।" বরদাবাবু কহিলেন,—"এখন কোন্‌দিকে যাওয়া ঠিক্ কল্লেন ?"

"এখনও কিছু ঠিক করে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। ষ্টেশনে গিয়ে যা'হয় একটা ঠিক কর্‌বো।" "এ ঠিক নয় বিজয় বাবু; জীবনটাকে এমন ভাবে শাসন-শৃঙ্খলার হাত এড়িয়ে ছেড়ে দিবেন না। উশৃঙ্খলতাই আমাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতনের কারণ। আর ভোরের গাড়ীতে যাওয়া হচ্চে না, সে কথাও বলে রাখছি, বিমলা কি আপনাকে এতদিন পরে না খাইয়ে বিদায় দিবে ?"

"আমরাই কি তা দোবো !"—এ কথা বলিয়া লীলা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মানুষ যত বড় চতুরই হউক না, যত বড় কপটই হউক না কেন, মনের অভিব্যক্তিগুলির ক্রিয়া কোন রকমেই সে গোপন রাখিতে পারিবে না, ভাষা তখন মৌনভাবে আকৃতির ভিতরে তার বিকাশ সাধন করিবে, স্বর তার স্বাভাবিকতা কোন রকমেই রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা অতি সহজ সরল কথা। লীলার দৃষ্টি, লীলার কথা—কোনটাই বিজয়ের চক্ষু বা কর্ণ এড়ায় নাই, সে সব কথা যে তাহার কানে বসন্তের কোকিল ঝঙ্কারের মত বড় মধুময় বোধ হইতেছিল। তাহার এ কেন ? সে যে এই দুর্ব্বলতাটুকু হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায়। কেন তাহার মন বিক্ষিপ্ত হইবে ? সে যে হইতেই পারে না। প্রথম যৌবনে প্রাণ যখন ভালবাসার জন্য লালায়িত হয়, তখন যদি

তাহার বিকাশ না ঘটে—তবে—তবে সেই মুকুলিত পুষ্পটিকে যতই চাপিয়া রাখ না কেন, কোন শুভ মুহূর্তে সে নিশ্চয়ই সুন্দরীর অলক্ত-চরণ-স্পর্শে প্রস্ফুটিত অশোক স্তবকের ন্যায় কোন না কোন তরুণীর করুণ কোমল চাহনাতে ফুটিয়া উঠিবেই। সেখানে বিদ্রোহী হইলে চলিবে না, আর বিদ্রোহী হইয়া পারিবেও না, বিবেক ভ্রূকুটি কটাক্ষ করিলেও তাহাতে ফল ফলিবে না। বিদ্রোহী চিত্তই বিজয়ী হইবে। নানা কথা কাটাকাটির পর শেষটায় ঠিক হইয়া গেল—পরদিন বিকেল বেলার গাড়ীতে বিজয় চলিয়া যাইবে।

তের

লীলাও ভাল করিয়া বিজয়কে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; কুয়াসায় ঢাকা প্রকৃতির স্বচ্ছ আবরণের মত কি যেন এক বিচিত্র রহস্য-কাহিনী যে তাহার জীবন ঘিরিয়া রহিয়াছে, সেটা সে বিশেষ করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। যেখানে পরাজয়—যেখানে কিছু বাধা—যেখানে কিছু গোপনের ভাব প্রকাশ পায়, মানুষের চিত্ত ঠিক সেখান হইতেই গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইতে চাহে। বিজয়ও বুঝিতেছিল যে সে আর নিজেকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ তাহার আগের মত তেমন সরল সাহসও নাই যে সব কথা বলিয়া যাইতে পারে। সে কোন রূপেই তাহার

গোপন ইচ্ছাটাকে ব্যক্ত করিতে চাহে না, তার এ দুর্ব্বলতা কেন? আর লীলা! সেও যে কেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এ দুর্ব্বলতাত তাহার কোন দিন ছিল না। সে যে বিদ্যালয় হইতে সুরু করিয়া কলেজের শিক্ষা শেষ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু পুরুষের সহিত মুক্ত কণ্ঠে আলাপ করিয়াছে, হৃদয় একটুও ত কাঁপে নাই, কোন দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই। আজ বিজয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে গেলে ক্রমাগতই তাহার চারিদিকে লক্ষ্য পড়ে,—কাপড়ের পাড়টা এলাইয়া পড়িল কি? মাথার কুন্তলগুচ্ছ একটু এলমেলো হইয়া পড়িল বুঝি; ব্রুচটা বুঝি ঠিক যায়গায় নাই; জুতার গোড়ালিটা কি বিশ্রীই না দেখায়—কেন এসব?

উভয়ের হৃদয়েই দুর্ব্বলতা। লীলার পাণ্ডুর মুখ বিজয়ের সহিত চথোচোখি হইলেই লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিত।

বরদা বাবু বারেন্দা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে—বিজয় ও লীলা, দু'জনে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে বিজয় কহিল—"দেখুন, কাল আপনাদেব ছেড়ে যেতে যে কত বড় আঘাত পাব, যাব এ কথা মনে করেই তা অনুভব কর্ত্তে পাচ্ছি; কে জানে জীবনে আর কখনো দেখা হবে কিনা।" এই বলিয়া বিজয় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কি ভাবছেন মিস্ রায়?"

লীলা মৃদুস্বরে কহিল—"তা কেন হবে? নিশ্চয়ই আবার

আমাদের দেখা হবে।” হাজারের মধ্যে দু’দশজন বাঙ্গালীর চিত্ত কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ হতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই দুর্ব্বল—স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের। জলভরা মেঘের মত দুইটী তরুণ হৃদয়ের মধ্যে যে প্রাণের আবেগ পোষণ করিতেছিল তাহা লজ্জার বাধায় আর অগ্রসর হইল না। বিজয়ের চোখে সেই তরঙ্গে ভাসমানা সুন্দরীর রূপলহরী, তারপর শয্যায়শায়িতা লীলার সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যরাশি কেবলি ভাসিতেছিল। লীলার কাছে বিজয়ের দীপ্ত গৌরকান্তি পৌরুষ-সৌন্দর্য্য জগতের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া মনে হইতেছিল।

*　　*　　*　　*

পরদিন বিকেল বেলা নরেন্দ্র বাবু, বরদা বাবু, লীলা ও অন্যান্য কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালী বিজয়ের সহিত ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিলেন। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য; কত দেশদেশান্তরের যাত্রী গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে নিরূপিত সময়ে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজগামী গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল। বিজয় একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে যাইয়া উঠিয়া বসিল। সকলে একে একে বিদায় লইলেন। লীলার সহিত শেষ বিদায় লইবার সময় সে আপনাকে সামলাইতে পারিল না; খপ্ করিয়া সে লীলার দুইখানা কুসুম কোমল হস্ত দুই হাত দিয়া চাপিয়া কহিল—“মিস্ রায়, তাহ’লে দয়া করে মনে রাখবেন।”

লীলার বাক্য স্ফুরণ হইল না কিন্তু তাহার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দু'টী হইতে দুই অশ্রু বিজয়ের হাতের উপর গড়াইয়া পড়িল, সে আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পাহিতে পারিল না। ধীরে ধীরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল! বরদা বাবু ও নরেন্দ্র বাবু ষ্টেশনের বারেন্দায় দাঁড়াইয়া রুমাল নাড়িতে লাগিলেন! বিজয়ের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না—সে দেবীপ্রতিমার মতো দণ্ডায়মানা লীলার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য চিত্র, যতক্ষণ দৃষ্টি চলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছিল,—লীলাও একই ভাবে গতিশীল গাড়ীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল!

যখন গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল তখন সে আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিল, নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "এই যে মিস্ রায়, ভালত?" লীলা ফিরিয়া দেখিল ওভারকোটে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ও চোখে নীল রঙের চস্‌মা পরিয়া অমল দাঁড়াইয়া, তাহার সাম্‌নে প্রচুর লটবহর ও লোকজন! লীলা তাড়াতাড়ি অমলকে প্রতি নমস্কার করিয়া নরেন্দ্র বাবু ও বরদা বাবুর নিকট চলিয়া আসিল এবং ব্যস্ত ভাবে বাড়ীর পথ ধরিল। অমল তাহাদিগকে দেখিতে পাইল— সেদিকে অগ্রসর হইল কিন্তু কাছে আসিয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইল যে তাঁহারা ষ্টেশনের দরজা ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

চোদ্দ

তারাসুন্দরীর কোন কথাই রহিল না, তাহার মিনতি, তাহার অনুরোধ বাক্য কিছুতেই রাধাকান্ত বাবুর মন টলিল না। দরিদ্রের এত তেজ কেন? অর্থহীন নিরন্নের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই হইবে! দেখা যাউক কতদিন সে দারিদ্র্যের নির্য্যাতন সহিয়া আপনাকে সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারে! পূর্ব্বে জামাতাকে যে মাসিক ত্রিশ টাকা সাহায্য পাঠাইতেন তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। বাড়ীর সকলের উপর কড়া হুকুম হইল, কেহ যেন সেই পাজি হতভাগা নচ্ছার ছোঁড়াটার সম্বন্ধে কোন কথা আর তাঁহার নিকট না বলে। কমলা স্বামীর এতটা অপমানে কোনরূপেই আপনাকে অপমানিতা মনে করিল না! স্রোতের ফুল যেমন ভাসিতে থাকে, সেও তেমনি লক্ষ্যহীন ভাবে ভাসিয়া যাইতে লাগিল! তবু কন্যার চিত্ত সেই অপদার্থ দরিদ্র স্বামীর জন্য কাঁদিয়া উঠে, পাছে সে আবার একটা গোল বাধাইয়া ফেলে; কারণ মেয়েদের বিশ্বাস কি? যাহাকে পরের করে সমর্পণ করা হইয়াছে, দেবতা ও বিগ্রহ সাক্ষী করিয়া যাহাকে অপরের হস্তে দান করা হইয়াছে, সেই কন্যার স্বামীর প্রতি চিত্তের আকর্ষণ থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এজন্য বুদ্ধিমান রাধাকান্ত বাবু কমলাকে ডাকিয়া সব কথা বুঝাইয়া কহিলেন "কোন চিন্তা নাই মা! আমি তোমাকে পথের কাঙাল করে যাচ্ছি না, আমার

অভাবেও যাহাতে তোমার কোনও কষ্ট না হয়, তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পার, আমি সে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, যত দিন না বিজয় এসে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে—ততদিন পর্য্যন্ত তুমি তাকে ভুলে যাও মা, মনে কর তুমি কুমারী! আমায় সে যে অপমান করেছে, সে অপমানের প্রতিশোধ চাই—শাস্তি চাই।”

বিধাতার সৃষ্টি রহস্যময়। রুক্ষ বন্ধুর পাষাণ গঠিত কঠিন পর্ব্বতও তাহার সৃষ্টি আর স্বচ্ছ শীতল সলিল বাহিনী জাহ্নবীর ধারাও তাঁহার সৃষ্টি! নারী করুণাময়ী, নারী পাষাণীও বটে। কমলা—স্থির নিশ্চল পাষাণে গড়া মূর্ত্তির মত দাড়াইয়া পিতার কথাগুলি শুনিল—দরিদ্র স্বামীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও বিদ্রূপের অট্টহাস্যও তাহার কর্ণে পশিল, তবু সে দ্বিধা সঙ্কোচ বিহীন চিত্তে দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, “বাবা, আমি কবে তোমার অবাধ্য হয়েছি বল? সংসারের সকলেইত আমাকে ঘৃণা করে, শুধু তুমিই আমায় ভালবাস, তোমার স্নেহই আমার অক্ষয় কবচ; তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।” রাধাকান্ত বাবু উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, “আশীর্ব্বাদ করি মা, তুমি চির সুখিনী হও।”

তারাসুন্দরী বারবার আঘাত পাইয়া রোগশয্যায় একেবারে গা ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর দুর্ব্যবহার, কন্যার অমানুষিক ভাব তাহাকে উন্মত্তা করিয়া তুলিল। মেয়ে মানুষের একি আচরণ!

স্বামী যে স্ত্রীলোকের একমাত্র আরাধ্য দেবতা, আর স্ত্রী যে স্বামীর চির আদরিণী। একে অন্যের অভাবে সংসার যেখানে অচল হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে একি বিষম ব্যবধান! বিজয়ের বিষাদমাখা মুখখানা মনে করিয়া তাহার হৃদয়ের শান্তি সুখ একেবারে চলিয়া গেল! তাহার মাথার যন্ত্রণা, বুকের ব্যথা ডাক্তারের ঔষধে পথ্যে বা শুশ্রূষায়—কোনরূপেই কমিবার দিকে নামিল না, কেবলি বাড়িয়া চলিল। কি করা যায়? মেয়ে কি এমনি করিয়া স্বামী থাকিতেও স্বামী সোহাগিণী হইবে না। সে দিন রাধাকান্ত বাবু বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। তারাসুন্দরী জানালার ধারের সোফায় শুইয়া সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতেছেন; পাশে কমলা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তারাসুন্দরী ধীরে ধীরে কমলার হাতখানি ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিলেন,—

"কমলা।"

তাহার স্বরের মধ্যে এমন একটা বেদনা মাখান ছিল যে কমলা হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল,—

"কি মা?"

"সত্যি বল্‌বি মা?"

"আমিত কোনোদিন মিছে কথা বলি নি মা!"

"বেশ, তবে শোন মা?"

"কি মা? তুমি অমন কচ্ছ কেন মা?"

"কই, কিছুত না! মা, কমল—তোকে জিজ্ঞেস করি, তুই কি বিজয়কে ভালবাসিস?"

কমলা এমন একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন আশা করে নাই! তার সারা শরীর বহিয়া একটা বৈদ্যুতিক-প্রবাহ ছুটিয়া গেল, সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া—বেশ একটু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল "এ কথা কেন জিজ্ঞেস কচ্ছ মা?"

"অমনি—তবে কি জানিস্ মা—স্ত্রীলোক যত বড় কঠোরই হউক না কেন, সে কখনো তাহার স্বামীকে ভুলতে পারে না, স্বামীর প্রাণে আঘাত দিতে পারে না, কেন না স্বামী—স্বামী, যে নারী পতির প্রাণে ব্যথা দিতে পারে, সে পাষাণী, সে রাক্ষসী, সে পিশাচী! তুই আমার মেয়ে হয়ে কি রাক্ষসী হতে চাস?" এ কথাগুলি বলিবার সময় তাঁহার চোখ দিয়া বজ্রাগ্নির ন্যায় তেজরাশি ছুটিয়া বাহির হইতেছিল, কণ্ঠে তাঁহার অমানুষিক তেজ ও দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল।

কমলা, মাতার এই তেজোদ্দীপ্ত বাণীতে স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার বাক্য নিঃসরণ হইল না। তারাসুন্দরী বলিয়া যাইতে লাগিলেন "আমার বই পড়া বিদ্যে নেই মা, স্ত্রী পুরুষের সমান বিধান কোন দিন জগতে চল্‌বে কিনা জানি না; তবে এ কথা জান্‌বি, নারী—নারী, পুরুষ--পুরুষ! পুরুষের চরিত্রে যা শোভন হয়, নারীর চরিত্রে তা কখনো খাটবে না, নারীর ভালবাসা, স্নেহ

মমতাই হচ্চে জীবনের সার ধর্ম্ম, আর পুরুষের পৌরষত্ব, শক্তি দৃঢ়তা হচ্চে পুরুষের ধর্ম্ম। যেথানে সে বিধান প্রত্যাখাত, সেখানে বিষবৃক্ষ উঠ্‌বেই! যে নারী স্বামীর অপমানে আপনাকে অপমানিতা মনে করে না, লজ্জা বোধ করে না—সে নারী হতভাগিনী! একদিন সতী শিবের নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। উনি বিজয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন—একটা মনগড়া দোষ তৈরী করে, তুই কেন তার প্রশ্রয় দিচ্ছিস্, তুই কেন তাকে বুঝিয়ে বলিস্ না, 'না এ হ'তে পারে না' তাহলে কি এতটা দাঁড়াতে পারত? আমার কথা শোন কমল, আমি তোর মা, মা যেমন মেয়ের কষ্ট বোঝে, বাপ কখনো তেমন বুঝতে পারে না, তুই বিজয়কে চিঠি লেখ্, ক্ষমা চা, সে বড় ভাল ছেলে, সে তোকে ক্ষমা কর্‌বে।

কমলা ক্রুদ্ধা রাজহংসীর মত গ্রীবা উচ্চ করিয়া কহিল, "আমিত কোন অন্যায় করিনি মা! কেন আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে যাব, সে আমি পারবো না—মা!"

তারাসুন্দরী স্তম্ভিত হইয়া কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন—তারপর অতি কোমল কণ্ঠে নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, "এ তেজ থাক্‌বে না! একদিন তোর এ গর্ব্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে!" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আমি মা—তোকে অভিশাপ দিতে পারি না, কিন্তু আজ আমার ঠোঁটের কাছে কেবলি যে অকল্যাণের বাণী এসে ধাক্কা দিয়ে

বেরুতে চায়। আর তাকে যে রোধ করতেই হবে! কিন্তু কমল, একদিন তুই এ ভুল বুঝবি, কিন্তু সেদিন হয়ত তোর এ মা আর বেঁচে থাকবে না।"

কমলা আর কোন কথা কহিল না! এমন সময়ে রাধাকান্ত বাবু ঝড়ের মত বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "গিন্নি, শুন্‌ছো! শোন! বড় সু-খবর!" তারাসুন্দরী কৌচের উপর দুইটী বালিশের উপর ভর দিয়া মাথা তুলিয়া কহিলেন "বল।"

শচী ব্যারিষ্টারী পাশ করেছে, আস্‌ছে মেইলে দেশে আস্‌বে!" গৃহিণীর দুই চোখ বাহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল! চোখের জল মুছিয়া, অতি করুণ স্বরে কহিলেন, "আহা! বেঁচে থাক্, বাছাকে আমার দেখে যেন মরি!" "একি বল্‌ছো মা!"—কমলা সব ভুলিয়া গিয়া সহজ সরল ভাবে এই কথাটি বলিয়া ফেলিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তারাসুন্দরী কহিলেন, "তা বই কি! আমার যে দিন বড় ঘনিয়ে আস্‌ছে! আমি তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি।"

রাধাকান্ত বাবু একটু ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—"তোমার ঐ এক কথা।"

পনর

শচীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড হইতে বি, এ, উপাধি লাভ ও তারপরে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সুদূর প্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া আসিবার আনন্দ যে কি পরিমাণ হৃদয়কে তোলপাড় করিয়া তোলে, প্রাণের সে আনন্দ ঝঙ্কার ঠিক ভাষায় ফুটিয়া উঠে না। আবার সেই পিতা মাতার চরণ দর্শন, পরিবারের বিমল প্রীতিলাভ আর দেশ-জননীর অপরূপ সৌন্দর্য্যধারার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়া শৈশবের শত মধুরস্মৃতি নবভাবে অনুভব করা—সে যে কি পরমলাভ,—তাহাতে কি অপরূপ আনন্দ, সে মধুর কথা ভাবিতে ভাবিতে নীল সাগর জলে ভাসমান সোণার কমল ইংলণ্ডের প্রান্তভূমি ছাড়িয়া, সে দেশের দিকে যাত্রা করিল।

নানা সাদর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনার মধ্য দিয়া গৌরব-মণ্ডিত মস্তকে শচীন্দ্র আবার হাসিমুখে আসিয়া পিতামাতার চরণ-বন্দনা করিল। স্নেহময়ী জননী পুত্রের মস্তক চুম্বন করিয়া বুকে টানিয়া লইলেন। ঠিক খাঁটি বাঙ্গালীর মত সাধারণ বেশভূষায় সাজিয়া যখন শচীন্দ্র সকলের মাঝখানে অতি সরল ও সহজ ভাবে আসিয়া আপনাকে প্রকাশ করিল, তখন অতি বড় নিন্দুকের দলেরও রসনা কণ্ডুয়ন থামিয়া গেল, সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিল—"সাবাস ছেলে

বটে, যেমন বিদ্যা, তেমনই বুদ্ধি! "সমাজ কিন্তু উহা নীরবে সহিল না, রাজাই হও, জমিদারই হও, ধনীই হও, দরিদ্রই হও—একবার তাহার চরণধূলির কাছে মাথাটা নীচু করিতেই হইবে। বাহিরের লোকে যে পরিমাণ আনন্দের সহিত এই ধনী পরিবারের সুশিক্ষিত যুবকটীকে দেশের আশা-প্রদীপ জ্ঞানে প্রশংসার কলনিনাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল,—কিন্তু দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই চলিতেছিল। সেখানে গ্রামের কৃতবিদ্য যুবকগণ ও কন্যাদায়-গ্রস্ত জন কয়েক দীন ভদ্র সন্তান ব্যতীত গ্রামের বা সমাজের আর কেহই তেমন ভাবে তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন না। তর্কালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার ও গ্রামের নিষ্কর্ম্মারদল—যাহারা চিরদিন জমিদার পরিবারের অর্থ সাহায্যে উদর পূর্ত্তি করিয়া আসিতেছে, তাহারা পর্য্যন্ত এখন সমাজের ত্রুটী ধরিয়া মুরুব্বির মত রাধাকান্ত বাবুকে বিবিধ অযাচিত উপদেশ দানে পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কহিলেন—"শেষটায় কি কর্ত্তা ম'শাই, সাত পুরুষের পিণ্ড লোপ করবেন, সমুদ্র-যাত্রায় যে সব ধর্ম্ম-পণ্ড হয়।" রাধাকান্ত বাবু কহিলেন, "সংসারে কোনদিন কারু মুখের দিকে চেয়ে কাজ করিনি, সমাজকে চিরদিনই মেনে আসছি, মানবোও, তবে বেশী বাড়াবাড়ি কখনও সইব না। ছেলে শিক্ষার জন্য বিলেত গিয়েছে, ভগবানের কৃপায় সে মানুষ হয়েও এসেছে, সেত কোন অন্যায় করেনি,—প্রায়শ্চিত্ত যদি

দরকার হয়, সে পরে বোঝা যাবে। তবে শচীনের কি মত জানিনা। ছেলের অমতে আমি কোন কাজ করবো না। প্রায়শ্চিত্তের কোন আবশ্যক আছে তাত আমার মনে হয় না।"

শচীন ঠিক্ সেই সময়ে সেখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং গুরু-জনকে প্রণাম করিয়া কহিল—"আপনারা সব ভাল ত?" শচীনের সুন্দর গৌরদেহ জ্ঞান জ্যোতিঃ বিভাসিত বদন কমলের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দেখিয়া, সর্ব্বোপরি তার বিনয়-নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কাহারও বড় একটা বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তর্কালঙ্কার মহাশয় আনন্দে দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"বেঁচে থাক বাবা!" তখন তিনি সত্য সত্যই প্রায়শ্চিত্তের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এইবার রাধাকান্ত বাবু সুযোগ বুঝিয়া প্রায়শ্চিত্তের কথাটা পাড়িয়া বসিলেন। শচীন্দ্রনাথ ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল—'আমার ত মনে হয় না বাবা, প্রায়শ্চিত্তের কোন প্রয়োজন আছে; অন্যায়কে মেনে নিয়ে আমি কোন কাজ করতে রাজী নই। যদি এজন্য সমাজ আমাদের পরিত্যাগ করে—করুক; আমরা শিক্ষিত, আমরাই যদি সমাজের এই চোখ রাঙাণীতে হাল ছেড়ে দিই, তা'হলে দরিদ্রের উপর এর অত্যাচারের মাত্রাটা যে কত বড় হ'য়ে দাঁড়াবে! এই অত্যাচারকে আবহমান কাল থেকে আমরা নতশিরে, বিনা প্রতিবাদে মেনে এসিছি বলেই ত আজ সমাজের

এই হীনাবস্থা। আর বাবা! সমাজে থেকে—দেশে থেকেও ত আমরা সমাজের কোন বন্ধনকে মেনে চলিনি, সমাজের কোন অনুশাসনই কোন দিন মানিনি, খাওয়া দাওয়ার কোন্ বিচার আমরা মেনেছি? অথচ কই সমাজ ত কোন দিন চক্ষু গরম করে উঠেনি, বিলেত থেকে ফিরে বাড়ী এসেছি, অম্‌নি সকলেই 'প্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্ত' করে অস্থির করে তুল্‌ছেন। এ কি রকম?"

বিদ্যাভূষণ মহাশয় নস্য নিতে নিতে কহিলেন—"পিতৃপিতামহের চির প্রচলিত প্রথাটা কি হেলার জিনিষ বাবা?"

"তাত নয়ই, তবে কি জানেন বিদ্যাভূষণ মশায়, যদি আপনারা উদারতা দেখাতে পার্‌তেন, বিলেত ফেরত শিক্ষিত ভদ্র-সম্প্রদায়কে আনন্দে কোল দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌তেন—তা'হলে হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মহত্ত্বই প্রকাশ পেত, সমাজের এমন দুরবস্থা আর হ'ত না; কিন্তু সে দিন চলে গেছে এখন দু'টো সংস্কৃত বচনের জোরে কেউ শিরনত কর্‌তে রাজি হবে না, মনুষ্যত্বের কাছেই মানুষ আত্ম-বিক্রয় করে, দুর্ব্বলের চোখ রাঙানির কাছে নয়। আমি সমাজকে চাই না, আমাদের সমাজ, আমরাই গড়ে নিতে পারবো।"

বিদ্যাভূষণ মশায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, গ্রামের মাতব্বরের দল এ উহার মুখের দিকে চাহিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদের যুক্তি, তর্ক, বীরদর্প কোথায় ভাসিয়া গেল।

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন—"শচীনের যে মত, আমারও সেই

মত, আমি আমার ছেলের প্রায়শ্চিত্ত করাব না। সমাজকে যে ছাড়বো, তাও মনে কর্‌বেন না। যে ভাবে বরাবর চলে এসেছি ঠিক্‌ সেই ভাবেই চলবো। এখন আপনারা যা ভাল বোঝেন করবেন। আর আপনাদের ব্রাহ্মণ-সমাজ ত বিলেতফেরতেরা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লেও সমাজে গ্রহণ করবে না, তবে আর প্রায়শ্চিত্ত করে কি লাভ?"

বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ব্রাহ্মণ-সমাজের চাঁইয়েরদল এ কথার উপর আর কোন কথা বলিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে ব্যারিষ্টার বোস্‌ সাহেবের রূপসী ও বিদুষী কন্যা—প্রীতিবালার সহিত শচীনের মহাধূমধামের সহিত কলিকাতা সহরে বিবাহ হইয়া গেল, তারাসুন্দরী পুত্রবধূকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়া মনের ব্যথা মিটাইলেন। রাধাকান্ত বাবু এ বিবাহ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই সে বিবাহ সভায় উপস্থিত 'চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়' ভূরি ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফের ক্যামারায় আট্‌কা পড়িয়া গেলেন! ব্রাহ্মণ-সমাজের এইরূপে জয় হইল! বাঙ্গালার মাটী ছাড়িয়া শচীন্দ্রনাথ সপরিবারে বাঁকিপুর সহরে যাইয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়া দিল।

ষোল

কমলার সহিত তাহার শ্বশুর বাড়ীর গোলযোগের কথাটা শচীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াই শুনিয়াছিল, স্নেহময়ী মাতা কন্যার জীবনের সুখশান্তির দিকে চাহিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল বিবরণ পুত্রের নিকট কহিয়া উহার একটা প্রতীকারের উপায় চাহিয়াছিলেন। শচীন্দ্রও প্রথমতঃ কথাটা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল। এবং বিজয়কে পত্র লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছিল—কিন্তু সে যখন পিতার নিকট হইতে বিষয়টা আরও ভালরূপে জানিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিল, তখন রাধাকান্ত বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"এ হ'তে পারে না, শচীন।"

"কেন বাবা!"

"সে আমাকে যে ভাবে অপমান করেছে, সে শুধু আমার একার নয়, সমস্ত পরিবারের—সমস্ত বংশের—তোমাদেরও যে! এই দেখ বিজয়ের পত্র।"

শচীন্দ্রনাথ বিজয়ের পত্র পড়িয়া কহিল—"এতটা যে হয়েছে তাত জানতুম না; তা বেশ, কমলার জন্য ভাবনা কি? দেখা যাক্ না এ ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। সে মাকে যাইয়া কহিল—"মা, বাবা যা' বুঝেছেন তাই ঠিক, এখন বিজয়ের তত্ত্ব তালাস করতে গেলে নিজেদের খাটো করতে হয়, সে ত হতে পারে না, মা।"

শচীন্দ্রনাথের বাহিরের ব্যবহারে তাহাকে খাঁটি বাঙ্গালীর মত মনে হইলেও অন্তরে সে সাহেব হইয়াই দেশে ফিরিয়াছিল। শুধু যে কয়টা দিন দেশে ছিল, সে কয়েক দিন সাধারণ ভাবেই চলা ফেরা করিয়াছে, কিন্তু পূরাদস্তুর পাঁচবৎসরের অস্থি মজ্জাগত সাহেবী চালচলনটা সে ভোলে নাই, বাঁকিপুরে আসিয়া সে ঠিক সাহেবী ফ্যাসানে তাহার বাড়ীখানা সাজাইয়া গুছাইয়া লইল; গঙ্গার ধারেই তাহার বাড়ী—আদব কায়দায় ও সাজসজ্জায় উহা সাহেবের বাড়ী হইয়াই দাঁড়াইল। কলিকাতার জনবহুল "বার" ছাড়িয়া বাঁকিপুরে আসিয়া সে বেশ সোয়াস্তি বোধ করিল, তাহারত জীবিকার্জ্জনের জন্য উপার্জ্জন নয়, তাহার এই সখের ব্যবসা মাল বোঝাই নৌকার মত ধীর মন্থর গমনে চলিলেও কোন ক্ষতি নাই। সে যে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া আসিয়াছে ইহাই যে পরিবারের পরম সৌভাগ্য।

সুন্দর সুসজ্জিত বাড়ী। তরুণ যৌবন, অতুল ঐশ্বর্য্য, শিক্ষিতা প্রিয়তমা স্ত্রী—ইহা অপেক্ষা সংসারে শান্তি সুখের কি আছে? শচীন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তথাপি একটু নির্জ্জনতা প্রিয়, শান্তিপ্রিয় লোক— তাহার কাছে নব পরিণীতা প্রীতিবালাকে সুধাভাণ্ড করে সমুদ্রোত্থিতা লক্ষ্মীর মত মনে হইতেছিল। সে নবপ্রেমে মসগুল থাকিয়া আইনের কূটতর্ক ও মক্কেলের বাক্যজালকে সবলে ছাড়াইয়া ফেলিতে চাহিলেও নবাগত ব্যারিষ্টার সাহেবের হাতে মোকদ্দমা দিতে পারিলে জয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনাজ্ঞানে শচীনের

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার ব্যবসাটা বেশ জমিয়া আসিতেছিল। মালবোঝাই নৌকার পারবর্ত্তে উহা প্রথম হইতে যখন পালের জোরে দ্রুতগামী তরণীর মত ছুটিতে সুরু করিল, তখন আর কি করা যায়? অর্থটাকেও উপেক্ষা করা ঠিক নহে, হাজার জমিদারি রহিলই বা। বিশেষ শিক্ষিতা প্রীতিবালা পিতার অজস্র অর্থ উপার্জ্জনের মোহে স্বামীকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে উভয়বিধ প্রেমের মোহেই তাহাকে দিব্য আকর্ষণ করিয়া চালাইতে সুরু করিল।

মাতার অনুরোধে শচীন্ বিজয় ও কমলার মনোমালিন্য দূর করিয়া প্রাণে যে শান্তি আনিবার চেষ্টার উদ্যোগী হইয়াছিল—পিতার কঠোর বাণীতে তাহা দূরে ভাসিয়া গেল! আর অত ভাবনা ভাবিবার অবসরই বা তাহার কই? বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে একযোগে অনেকগুলি ঘটনা ঘটিয়া গেল—প্রায়শ্চিত্তের গোলযোগ, বিবাহ ও নূতন ব্যারিষ্টারীর হাঙ্গামা, কাজেই এত গোলযোগের মধ্যে সব দিক্ ভাবিবার অবসর কোথায়? তবু কর্ত্তব্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে যেটুকু অগ্রসর হইবার সংকল্প করিয়াছিল তাহাও আর হইল না। বিজয় ও কমলার প্রসঙ্গ উঠিবার আর কোনও সুযোগই ঘটিল না।

তারাসুন্দরীর দেহে যে কালব্যাধি দৃঢ়রূপে আসন গড়িয়াছিল, উহা ক্রমশঃই তাহাকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া আনিতেছিল, শেষটায় এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে ডাক্তাররা বলিয়া দিলেন যে সমুদ্রের হাওয়ায়

যদি উপকার হয় ভালই, নচেৎ এমন কোন ঔষধ চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই। যাহার ব্যবহারে এই দুরারোগ্য ব্যাধি দূর হইতে পারে।

রাধাকান্ত বাবু বাহিরে কঠোর প্রকৃতি ও একগুঁয়ে লোক হইলেও পত্নীকে যে ভাল না বাসিতেন তাহা নহে, তবে পাছে তাহার গোঁ ছাড়িলে লোকে কাপুরুষ ও দুর্ব্বল-চিত্ত বলে, এই অভিমান বা দম্ভের জন্যই অনেক সময় অন্তর স্নেহরসে সিক্ত হইলেও বাহিরে তাহা বিকাশ হইত না। কমলার কথা তিনি ভাবিতেন,—ভাবিতেন তাহার অভাবে কমলার কি হইবে কে জানে? সে জন্য বালিগঞ্জে তাহার জন্য বিরাট বাড়ী, প্রায় পঁচিশহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি এবং নগদ একলক্ষ টাকার কোম্পাণীর কাগজ কিনিয়া দিয়াছিলেন! অর্থ থাকিতে আর ভয় কি? এই অর্থের প্রলোভনে একদিন না একদিন সেই হতভাগা ছোঁড়া আসিয়া কমলের চরণ প্রান্তে লোটাইয়া পড়িবেই! সংসারে অর্থের চেয়ে যে আর কিছু বড় থাকিতে পারে এটা তিনি কোনরূপেই মানিতে চাহিতেন না। কর্ম্মজীবনে কেবলমাত্র তোষামুদের দল, নায়েব মুচ্ছুদ্দি ও বিবেক-বিহীন মুহুরীর দল দেখিয়া তাহার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে সংসারটা ঠিক্ এই শ্রেণীর লোকেই গড়া, কাজেই বিজয়ের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তার খুব বড় একটা উচ্চ ধারণা ছিল না।

সংসারে আনন্দ বলিতে যাহা কিছু, তাহা যে কত ক্ষণস্থায়ী

উহা নিজ নিজ জীবনের উপলব্ধি ব্যতীত বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। রাধাকান্ত বাবু যখন সর্ব্বভাবে জীবনকে মধুময় মনে করিয়া অতুল্য আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই তাহার জীবন-সঙ্গিনী পত্নীর জীবনের দিনগুলি অতি সঙ্কিপ্ত, ডাক্তারেরা একথাটা বিনা সঙ্কোচে প্রচার করিয়া দিলে, কঠিন চিত্ত রাধাকান্ত বাবুর প্রাণেও একটা বিষাদের হাহাকার ধ্বনি জাগিয়া উঠিল। তবে কি সত্য সত্যই তাহাকে হারাইতে হইবে নাকি? চিরজীবনের সঙ্গিনী, শান্ত স্থির ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি পত্নী, যে কোন দিন তাহার কোন বাক্যের প্রতিবাদ করে নাই, নীরবে সব সহ্য করিয়াছে, আজ কি সত্য সত্যই তাহার পরপারে যাইবার তরণীখানি ঘাটে আসিয়া লাগিল নাকি?

মৃত্যু কথাটা বড়ই ভীষণ। তুমি বিদ্বান হইতে পার, পণ্ডিত হইতে পার, বিচক্ষণ হইতে পার; কিন্তু মৃত্যুকে ভয় না করিয়া তোমার রক্ষা নাই; আর শোকগ্রস্ত কাহাকেও উপদেশ দিয়াও নিরস্ত করিবার সাধ্য নাই! সেখানে শাস্ত্র মূক—ভাষা স্তব্ধ।

দার্জ্জিলিংএর শৈত্য প্রদেশ ছাড়িয়া শচীনের বাড়ীতে তারা-সুন্দরীর চিকিৎসা চলিল। কিন্তু ক্রমশঃই অন্তিম দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। তারপর এমন হইল, এই বুঝি শেষ মুহূর্ত্ত! পূর্ণিমার রাত্রি, চারিদিক জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে, গঙ্গার নীলজলে জ্যোৎস্নার অপূর্ব্ব লাস্যলীলা। আজ রোগিণীর জীবনের আশা

আর নাই। স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ আমি তোমাদের সকলকে রেখে যাচ্ছি, এর চেয়ে আর স্ত্রীলোকের সুখ কি বল, তবে এক কথা—বিজয় ও কমলাকে সুখী দেখে যেতে পারলেই আমি সুখে মরতে পারতেম, কিন্তু বিধাতা মানুষকে সব সুখ দেন না! যাক্, আমার সময় হ'য়ে এয়েচে, আমার মাথায় তোমার পায়ের ধূলো দাও। হ্যাঁ, একটা কথা—স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে আর বড় গুরু নেই সে শিক্ষাটা কমলাকে দিও।" পরে মেয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মা কমল! মরণকালে আশীর্ব্বাদ করছি তোর যেন মতি ফেরে। বৌমা! কমলকে বুঝিও, তুমি মা বুদ্ধিমতী, লক্ষ্মী, সবত বোঝ মা!" আর কোন কথা বলার অবসর হইল না। কমলের শুভ কামনা করিতে করিতেই তারাসুন্দরী চক্ষু বুজিলেন। সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল! রাধাকান্ত বাবু স্তম্ভিতের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পত্নীর শব দেহের প্রতি তাকাইয়া বলিলে—"গিন্নী সত্য সত্যই তুমি চলে গেলে? উঃ!"

সতের

বিজয় চলিয়া গেলে লীলার কাছে পৃথিবীর সকল শোভা সম্পদ যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কেমন যেন একটা অজানা বিষাদের ছায়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। মন কি উদাস ভাবে

কি শূন্যতা লইয়া হাহাকারে গুমরাইয়া মরিতে লাগিল, এ ভাব ও ভাবনা চিত্ত হইতে দূর করিবার জন্য তাহার আগ্রহ ও চেষ্টা যত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু তথাপি সে পূর্ব্বের সরলতা ও প্রফুল্লতা কোন রূপেই প্রাণে জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না। বিজয় তাহার কে? কেহই না! কয়দিনেরই বা তাহার সহিত পরিচয়; তথাপি তাহার এ চিত্ত বৈকল্য কেন? তাহার কথা সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ মনের মধ্যে উপস্থিত হয় কেন! ভুলিতে গিয়াও ভুলিতে পারে না কেন? মনে করিবে না মনে করে বলিয়াই কি এত বেশী মনে পড়ে!

স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মনের ভাব যেমন সহজে ধরিতে পারে, পুরুষে তেমন পারে না। লীলার এই পরিবর্ত্তন টুকু বিমলার চক্ষু এড়াইতে পারিল না। সে একদিন লীলাকে কহিল—"বোন্! তুমি দিন দিন যে কেমন হয়ে যাচ্ছ! সে রূপ সে শ্রী নেই, কোন অসুখ হয়েছে কি? লীলা কুণ্ঠিতভাবে জড়িত স্বরে কহিল "কই, না।"

"তবে এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন ভাই! মুখের সে লাবণ্য শ্রী কোথায় গেল?"

"কি জানি।"

বিমলা লীলার এই কি জানির উত্তরে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সে কহিল—"তোমার কি অসুখ

বোন্. তা তুমি জাননা ?” এ কথার সঙ্গে সঙ্গে সে এমনি ভাবে তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ অপাঙ্গদৃষ্টি করিল যে লীলা কোনরূপেই আর মাথা তুলিয়া বিমলার দিকে তাকাইতে পারিল না। এমন সময়ে বেলা আসিয়া লীলাকে কহিল—

“মাসিমা আমাদের পড়া বলে দেবে না ?”

“কেন দেব না খুকু ? অমর কোথায় ?” ঠিক্ এমনি সময়ে অমর হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল,—“মাসি মা ! আমি Twinkle, Twinkle, Twinkle little star গাইতে শিখেছি। তুমি যেমনটি শিখিয়েছিলে ঠিক্ তেমনি শিখেছি। শুন্‌বে ?”

“শুন্‌বনা ? বাহাদুর ছেলে যা হ’ক।”

“আমায় কি দেবে বল ? প্রাইজ দেবে !”

“নিশ্চয় দেবো।”

“কি প্রাইজ দেবে ?”

“আগে গেয়ে শোনাও, তবেত ?”

“না—না না তা হবে না, আগে বল কি দেবে ?”

“একখানা খুব ভাল ছবির বই দোব।”

“তা বেশ হবে ! আচ্ছা তবে এইবার আমি গাই।” বালক মনের আনন্দে অর্গানের চাবি খুলিয়া মধুর স্বরে গান করিল।

লীলা আনন্দে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমু খাইয়া পাশের

ঘর হইতে একখানা ছবির বই আনিয়া তাহার হস্তে অর্পণ করিল। বালক মনের আনন্দে মায়ের কোলে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "তুমি কি দেবে মা ?"

বিমলা চোখের জল মুছিয়া কহিল, "সর্ব্বস্ব দোব বাবা !" বেলা দেখিল যা কিছু প্রশংসা—যা কিছু পুরস্কার সকলি অমরের ভাগ্যে জুটিয়া যাইতেছে, সে একেবারেই ঠকিয়া যায়, কাজেই সেও আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, লীলাকে কহিল—"মাসীমা আমিও গান গাইতে পারি—শুনবে ?"

বিমলা ও লীলা তাহার এই সরল সুন্দর আনন্দ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল—"শুনব না, কে বল্লে মা, এবার যে তোমার পালা। অমর যে ছোট ভাই তাই সে আগে গান গাইলে, এইবার তুমি গাও লক্ষীটি !"

এবার বেলার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সেও তাড়াতাড়ি অমরের মত অর্গানের কাছে যাইয়া ছোট টুলখানির উপর বসিয়া মধুর স্বরে গান ধরিল—

"মধুর মাধুরী জাগে ভুবনে
হাসে নবীন তপন চন্দ্র নীল নির্ম্মল গগনে।
সাগরের নীল বুকে, লহরী নাচিছে সুখে
নির্ঝর ঝর্ ঝর্ উছলে বনে !
পথহারা মেঘগুলি উধাও যেতেছে চলি
ধরণী কহিছে কথা বিহগ গানে !
সুন্দর শরত হাসে নিখিল প্রাণে।"

সত্য সত্যই তখন বাহিরে শরতের নীলাভ রৌদ্রে চারিদিক্ উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। মধুর বিহগ-রবে অপরাহ্নের শান্ত সৌন্দর্য্য চির মধুময় বলিয়া মনে হইতেছিল। দরোজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথ এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। গান থামিলে তিনি ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেলা ও অমর দুই জনে দুই দিক্ হইতে দাদামহাশয়ের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া একসঙ্গে চীৎকার করিয়া কহিল—

"দাদামশাই, আমরা আজ গান গেয়ে প্রাইজ পেয়েছি।" নরেন্দ্র বাবু স্নেহগদ্‌গদ স্বরে কহিলেন—"বেশ।" লীলা ও বিমলা তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া নিজে একখানা কৌচের উপর বসিয়া বিমলাকে বলিলেন—

"বৌমা দেওয়ানজীর চিঠি এসেছে।" কোনও বৈষয়িক আলোচনা হইবে মনে করিয়া লীলা চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই নরেন্দ্র বাবু বাধা দিয়া কহিলেন—"তোমায় যেতে হবে না মা, তুমি বস। দাওয়ানজী পুরী থেকে লিখেছেন সেখানে আমাদের বাড়ী তৈরী হয়েছে, আমাদের থাক্‌বার সব বন্দোবস্তও ঠিক হয়েছে, আমরা সেখানে পৌঁছিলে তবে সে দেশে যাবে। বুঝ্‌লে মা শোকে অন্ধ হলেত চল্‌বে না। এখন তোমায় বুকে পাষাণ বেঁধে সব দিক দেখ্‌তে হবে। তুমিই আমার দেবেন, তুমিই

আমার সব। আমিত খেয়াঘাটে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক পড়ল বলে। যে ক'দিন আছি সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে যাই। আর দেখ তিন চার মাস পুরী থেকে তারপর একবার দেশে যেতে হবে, কি বল ? তারপর এ বুড়োকে আর পাবে না মা, জগন্নাথদেবের চরণতলে এ দেহটাকে ফেলে রাখতে চাই। সাগরের জল ছাড়া এ পোড়া বুকের বেদনা আরত কিছুতে নিববে না মা।" বৃদ্ধের কণ্ঠ কাঁপিতেছিল। একটু পবে ধীর গম্ভীর স্বরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—"কি বল মা ?" বিমলা সুস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল—"বাবা, আমিত আমার মন বেঁধেছি। সুখও যাঁর দান, দুঃখও তাঁরই দান। আমাদের মাথা পেতে না সয়েত কোন উপায় নেই। তিনি যাদের রেখে গেছেন তাদের মানুষ করে তোলাই যে আমার কাজ বাবা !" পরে নতমস্তকে ধীরে ধীরে বলিল "আর ভেবে কি হ'বে বাবা ?"

লীলা প্রশংসমান চক্ষে বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অন্তঃপুর নিবদ্ধা রমণীর হৃদয়ের এই দৃঢ়তা তাহার প্রাণে একটা আনন্দ ও উৎসাহ জাগাইয়া দিল। তাহার ক্ষুদ্র উপদেশ বা আশ্বাসবাণী যে বিমলার প্রাণে এমন করিয়া এত সহজে ক্রিয়া করিবে সে যে তাহার কল্পনাতীত ছিল। আজ সত্য সত্যই তাহার কাছে একটা অজানিত নূতন স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া গেল। সে ভাবিল এমন রমণীর সঙ্গ বা বন্ধুত্ব লাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

নরেন্দ্র বাবু প্রশংসমাননেত্রে পুত্রবধূর দিকে তাকাইয়া কহিলেন—

"মা তোমার কামনা পূর্ণ হউক, তোমার কার্য্যে আমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি হউক, এই আমার আশীর্ব্বাদ তুমি বেঁচে থাক, দীর্ঘ জীবন লাভ করে দেশের ও দশের কাজ কর। তোমার ছেলে মেয়ে তোমার শিক্ষাগুণে গড়ে উঠুক। তোমার যে কাজ করে আনন্দ হয়, তৃপ্তি হয়, তাই কর।"

বিমলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা নীচু করিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল—"তা'হলে কবে পুরী যাবেন ?"

"সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই, দেরী করে আর কি লাভ।" লীলা এ সংবাদে আনন্দিত হইল। একটা দারুণ অশুভ গ্রহের হাত হইতে নিস্তার পাইবার শুভ সুযোগ পাইয়া সে স্বোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল মুখে বিমলাকে কহিল—"ভাই, তোমার মত মহীয়সী রমণীর সঙ্গলাভ বিধাতার আশীর্ব্বাদের ফল।"

আঠার

কোন কোন মানুষেব এমন একটা ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা অতি সহজেই অপরের চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলে। তাহাদের চরিত্রের শত সহস্র ত্রুটিও ভুলিয়া যাইয়া অতি বড় বিচক্ষণ ব্যক্তিও আপনার করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করে না। অমল ঠিক এই শ্রেণীর লোক।

ওয়ালটেয়ারে আসিয়াও তাহার স্বভাবসিদ্ধ মিশিবার গুণে ও শিষ্টাচারের অভিনয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নরেন্দ্র বাবু ও বরদা বাবুর সহিত বিশেষ করিয়া আত্মীয়তা ঘনাইয়া তুলিল। যে বরদা বাবু কলিকাতা থাকিতে অমলকে কোন কোন দিন দুই একটা রূঢ় কথা বা অপ্রিয় বাণী শুনাতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি কিন্তু এখানে এই দূরদেশে তাহাকে পাইয়া তাঁহার প্রেত-তত্ত্বের বিষয়গুলির আলোচনার সুযোগ হইল মনে করিয়া প্রসন্ন চিত্তেই অমলকে গ্রহণ করিলেন। অমলের বরদা বাবুর এই দুর্ব্বলতাটুকু বিশেষরূপেই জানা ছিল। বৃদ্ধের চিত্ত জয় করিতে না পারিলে যে তাহার কোনও ভরসা নাই ইহা মনে করিয়া সে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিবধ পুস্তকাবলি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়াও আসিয়াছিল। প্রথম দিনের সাক্ষাতেই সে এই বিশেষ কথাটা বরদা বাবুকে বলিতে ভুলিয়াও যায় নাই। বরদা বাবু এ সংবাদে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অমলের এখানে আসিবার পূর্ব্বেই কলেজের ছুটি উপলক্ষে অরুণা এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। অমল প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় বরদা বাবুর বাড়ীতে নিয়মিত দর্শন দিতে ভুলিত না। এদিকে লীলা কিন্তু অমলের এত ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতে ছিল। সে অতি বিচক্ষণার সহিত অমলের সঙ্গ এড়াইয়া চলিত! অরুণার দৃষ্টি তাহা এড়ায় নাই। সে মনের মধ্যে অমলের চিত্ত জয় করিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প

করিয়াছিল, তাহার সে বাসনা—সে বিজয়ের বাধা যদি আপনা হইতে দূর হইয়া যায়। সেত তাহার পরম লাভ। কাজেই সে উৎফুল্ল চিত্তে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় চায়ের পেয়ালাটি অমলের কাছে পৌঁছাইয়া দিবার সহিত বঙ্কিম চপল হাসির বিদ্যুৎ কটাক্ষ হানিয়া দিত। তাহার জয় যে অতি নিকটে আসিতেছে, সে আনন্দে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একদিন এ আনন্দের দ্রুত তরল তরঙ্গ নর্ত্তনের উপরে ঝড়ের বাতাস আকুল আবেগে চারিদিক সন্ত্রাস্ত করিয়া ছুটিয়া চলিল।

একদিন আলোচনার শেষে অমল উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই বরদা বাবু কহিলেন—"তুমি আর এখানে কতদিন থাক্‌বে অমল?"

"আজ্ঞে, অক্টোবর মাসটা সব থেকে যাব।"

"তোমার কাছে এ জায়গাটা কেমন মনে হচ্চে?"

সোল্লাসে অমল বলিয়া উঠিল। "চমৎকার।"

"আমরা কিন্তু এখান থেকে চলে যাচ্ছি। নরেন বাবু পুরী যাবেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে সেখানে যাব। তুমিও এলে—আমাদেরও যাবার আয়োজন সুরু হলো। এবার তোমাকে পেয়ে আমি বড়ই সুখী হয়েছিলাম।"

অমল কহিল—"আপনারা চলে যাচ্ছেন, এ সংবাদ যে আমার পক্ষে বড়ই দুঃসহ!" তারপর খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মাথাটি

একটু উঁচু করিয়া ধীরে অতি মধুর কণ্ঠে কহিল—"দেখুন, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি এত বেশী জানেন যে আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা আছে। আমার ইচ্ছা ছিল, আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিছু দিন বেশ ভাল রকম শিখে নিই, সে জন্যেইত তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম। কিন্তু—

এই প্রশংসায় পুলকিত চিত্তে বরদা বাবু তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"তা বেশত! তা বেশত! তুমি বড় ভাল ছেলে। আজকাল তোমার মত ভাল ছেলে কই বড় ত একটা দেখতে পাওয়া যায় না।"

এক একজন মানুষের এমন একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা আছে যে সময় ও সুযোগ বুঝিয়া তাহাতে আঘাত দিলেই উহা আপনা হইতে বাজিয়া উঠে।

অমল দীর্ঘ একমাসকাল ক্রমাগত বৃদ্ধের মন বুঝিয়া গতি বুঝিয়া এই ভুতড়ে কাণ্ডের আলোচনায় মাতিবার ভান করিতে করিতে সত্য সত্যই এ বিষয়ে রীতিমত পড়াশুনা করিতে সুরু করিয়াছিল! বরদাবাবু ও তাহার এই পরিবর্ত্তনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। যে লোক যে রসের রসিক্ সে ঠিক্ ভাবে বিভোর লোক পাইলে অতি সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বরদা বাবুরও এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। অমলের প্রতি বরদাবাবুর যাহা কিছু ক্রোধ বা বিরক্তির ভাব, ছিল তাহা অতি সহজেই

দূর হইয়া গিয়াছিল। অমলও এই সুযোগ টুকু পাইয়া কোনরূপেই তাহা নিরাশার সাগরে ডুবাইয়া দিল না। সে অতি বিনীত কণ্ঠে বরদাবাবুকে কহিল—"আমার একটী অনুরোধ আপনি রাখিবেন কি?"

বরদাবাবু উৎফুল্ল চিত্তে কহিলেন—"অনুরোধ, অনুগ্রহ, এ সব বিনয়ের কথা ছেড়ে দাও বাবা, তুমি কি বল্‌তে চাও সরল সহজ ভাষায় বল।" অমল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে কহিল—'মিস্ লীলা রায়ের কাছে আমার কিছু বলিবার আছে। আপনি যদি অনুমতি দেন,—

বরদাবাবু হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিতে করিতে কহিলেন—"এ আর বেশী কথা কি বাবা, তুমি কিছু মনে করোনা, পূর্ব্বে তোমার সম্বন্ধে আমার তেমন উঁচু ধারণা ছিলনা, লোকের কাছে নানা দুর্নাম শুনেছিলাম, তাই আমি কল্‌কাতা থাক্‌তে তোমাকে বড় একটা স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে পারিনি, কিন্তু আজ এই একমাস তোমার সঙ্গে মিস্‌বার সুযোগ পেয়ে বুঝ্‌তে পেরেছি, সংসারের লোকে মানুষের ভাল দেখ্‌তে পারে না, নানা মিথ্যা কাহিনী রটনা করে। তোমাকে বাবা, এখন আর তোমাকে লীলার অযোগ্য বলে আমার মনে হয় না। তুমি তাকে নিরিবিলি ভাবে তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর্‌তে পার। তার মত হলে— আমি কোন আপত্তি করব না। লীলাকে আমি এ বিষয়ে বল্‌বো।"

"আপনার অসীম স্নেহ। কালই কি সুবিধে হয় না!"

"তা হবে না কেন? আমি তোমাদের সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাব। তোমাদের পরস্পরের মনের অভিপ্রায় জেনে যা ঠিক্ করকে আমায় জানিও, আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করবো।"

অরুণা কাঠের মূর্ত্তির মত আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সব কথা শুনিতেছিল—হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া যাইতে তাহার আঁচল লাগিয়া টেবিল হইতে গুটি কয়েক চায়ের পেয়ালা ঝনাৎ করিয়া পড়িয়া গেল। বরদা বাবু কহিলেন—"রাত্রি অনেক হয়েছে, যাও বাবা! তোমাকে দারোয়ান এগিয়ে দিয়ে আসবে এখন।' "কোন দরকার হবে না' বলিয়া অমল সহসা বৃদ্ধের চরণ-ধূলি মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উনিশ

লীলা যে ভয়ের হাত হইতে মুক্তির একটা সহজ পথের সন্ধান পাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ের নাগাল পাইবার পূর্ব্বেই পিতার সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত আদেশ শুনিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বিধাতা কি সত্য সত্যই নানাদিক দিয়া নানাভাবে তাহাকে নাগপাশে জড়াইয়া রাখিবার জন্যই এই আয়োজন করিতেছেন! মঙ্গলময়ের কি ইহাই মঙ্গল বিধান?

যে পিতা শৈশবে মায়ের মত বুকে করিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, সেই বৃদ্ধ স্নেহময় চির মঙ্গলকাঙ্ক্ষী জনকের প্রাণে ব্যথা দেওয়া কি তাহার পক্ষে কোন রূপে শ্রেয়ঃ! লীলার অন্তর হইতে কেবলি বিবেক ধাক্কা মারিয়া একটা কথা মুখের নিকট তুলিয়া ধরিতেছি। না—না—না। তাহার মনে যখন এইরূপ তোলপাড় চলিতেছিল, ঠিক্ সেই সময়েই বরদাবাবু বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "লালা, চল সমুদ্রের ধার দিয়ে আজ বেড়িয়ে আসি। তুমি তৈয়িরি হও?"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"হাঁ বাবা, আমি তৈয়িরি! অরুণা কোথায়?"

বরদাবাবু কহিলেন,—'তার শরীর তেমন ভাল নয়, সে আজ বেরুবে না।' লীলা আজ সারাদিন অরুণার কোন খোঁজ করে নাই, অরুণাও অন্যান্য দিনের মত দিদির কাছে বড় একটা আসে নাই। দু'জনার মাঝখান দিয়া যে একটা ব্যবধানের খরস্রোতা তরঙ্গিণীর সৃষ্টি হইতেছিল লীলা তাহা স্বপ্নেও জানিত না। লীলা বুঝিতে পারে নাই যে কেমন করিয়া অদৃশ্য ভাবে তাহাকেই বন্দী করিবার জন্য নানাদিক্ হইতে নানাভাবে জাল তৈরী হইতেছিল।

সে পিতার সহিত ভ্রমণে বাহির হইল। সূর্য্যাস্তের তখন বড় বেশী বিলম্ব নাই। দুই জনে সাগর তীরের পথ ধরিয়া চলিতে-ছিলেন। লীলার দৃষ্টি মানবের দিকে নিবদ্ধ। একদিনের কথা আজ তাহার মনে হইতেছিল, সেও বেশী দিনের কথা নয়। সাগর

তাহাকে জননীর মত তরঙ্গ দোলায় দোলাইয়া মৃত্যুর পার হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে, সে করযোড়ে আদি জননী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে তাহার প্রাণের ভক্তি নিবেদন জ্ঞাপন করিল। আগের মত সে সমুদ্র দেখিয়া প্রফুল্ল হয় না, বরং আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

একটা পথের মোড়ে হঠাৎ অমল আসিয়া তাহাদের সঙ্গ লইল। সে এমনি আকস্মিক ভাবে আসিয়া তাহার দর্শন দিল যে লীলা সহসা তাহার নমস্কারটি ফিরাইয়া দিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পায় নাই। অমলকে দেখিয়া বরদাবাবু ঈষৎ হাসিয়া প্রতি নমস্কার করিয়া কহিলেন "এই যে অমল!"

অমল হাসিয়া কহিল—"আমি অনেকক্ষণ এদিকে এসেছি, আপনারা আজ বোধ হয় একটু বিলম্বে বেরিয়েছেন!"

"তেমন নয়, তবে হ'য়ে পড়লো, একেবারে চা খেয়ে বেরলেম কি না।'

"আমি ঐ তাল গাছটার ছায়ায় উঁচু যায়গায় বসে সাগরের দিকে চেয়েছিলুম, সাগরের ভয়ানক শোভার উপমা জগতে মিলে না, কি বলেন মিস্ রায়?"

লীলা অকুণ্ঠিত ভাবে গ্রীবা উচ্চ করিয়া কহিল—"ভয়ানক যে সে কথা সম্পূর্ণ ঠিক এবং সে অভিজ্ঞতাও আমার আছে। অমল সহানুভূতি দেখাইবার ভাবে করুণ সমবেদনার সুরে কহিল—'উঃ কি বিপদই না ঘটেছিল।'

বরদাবাবু এইভাবে তাহাদের কথা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিলেন—"মা, লীলা! অমল তোমার সঙ্গে কিছুকালের

জন্য নিভৃতে কথা কইতে ইচ্ছুক, আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি, আমার অনুরোধ যে তুমি অমলের কি বল্‌বার আছে শোন। তুমি একটু আশ্চর্য্য হচ্চ, না। একজনের বিরুদ্ধে দশ জনের দশটা বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে একেবারে একটা মীমাংসা করে ফেলা, আমার মনে হয় সব সময়ে ঠিক হয় না। এ আমি তাকে তোমার অযোগ্য বলে মনে করি না। তবে একথা ঠিক্ যে তোমার স্বাধীন মতের উপর কোনরূপেই বাধা দোব না।"

বরদাবাবু এমনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে একথা কয়টি বলিলেন যে লীলার মুখ দিয়া কোনরূপেই আর বাক্য নিঃসরণ হইল না, অথচ তাঁহার বুকের মধ্যে এমন কতকগুলো কথা তোলপাড় করিতেছিল যে সেগুলি মুখের ভিতর দিয়া বাহির হওয়া কোনরূপেই উচিত নহে। বরদাবাবু কথা কয়টি বলিয়া আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না, অদূরবর্ত্তী তালীকুঞ্জের দিকে ধীর পদে চলিয়া গেলেন।

অমল ও লীলা দুইজনে স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। লীলার গণ্ডদেশে সারাদেহের রক্ত আসিয়া যেন জমাট বাঁধিয়াছিল। সে আর মাথা তুলিয়া অমলের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না। আর অমল, চঞ্চল-বাক্‌পটু উদ্ধত দুর্দ্ধর্ষ অমল, যাহার মুখ হইতে কথা অনবরত জলস্রোতের মত ছুটিতে থাকে—আজ সে মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইতেছিল না। খানিক পরে লীলা মৃদু হাসিয়া কহিল—"অমলবাবু! আপনার আমাকে কি কিছু বলিবার আছে?"

সে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কহিল—'মিস্‌রায়' তাহার কণ্ঠ হইতে জল পড়িয়া স্বর বাহির হইবার পথ যেন খুজিয়া পাইতেছিল না।

একটু সংযত হইয়া, একটু দৃঢ় হইয়া আবার কহিল "চলুন, অই উঁচু শৈলটার উপরে গিয়ে বসি।" লীলা সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া উঁচু শিলাখণ্ডের উপর যাইয়া উপবেশন করিল।

লীলা কহিল—"আপনি কি বলিবেন বলুন।" অমল কম্পিত-কণ্ঠে কহিল—"মিস্ রায়, আমি আজ এই দীর্ঘ দুই বৎসর কাল যাবৎ যে দেবীর উপাসনা করিয়া আসিতেছি, সে দেবী পাষাণী কি রক্তমাংস গড়া মানবী তাহাই জানিতে চাই।"

লীলা হাসিয়া কহিল—'দেবী কে জানি না, পাষাণীর অর্থও বুঝিতে পারিতেছি না, মানবীর অর্থও বুঝিলাম না, আপনি কি এই কথা বলিবার জন্যই আমাকে আহ্বান করিয়াছেন?"

অমল কহিল—"লীলা, এতদিন মনের যে কথা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহা তোমাকে বলিব, আমি জানি তুমি আমায় ঘৃণা কর, আমার নিকট হইতে তুমি দূরে থাকিতে চাও, জানি না কোন্ অপরাধে আমি এমন গুরুতর দোষে দোষী। তবু লীলা, আজ আমি তোমাকে আমার মনের কামনা প্রকাশ করিয়া বলিব, আমি তোমাকে ভালবাসি, সে ভালবাসার কথা আমি ভাষায় বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারব না। আমি যে তোমার যোগ্য নই, সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌বো, কিন্তু আমি জানি যদি আমি তোমাকে পাই তাহা হইলে আমার জীবনের পরিবর্ত্তন হ'ত, আমি একটা মানুষ হ'তে পার্‌তেম। দশ জনের একজন হ'য়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার্‌তুম, আমি শুধু এই ভিক্ষাটুকু চাই। লীলা—সহসা সে লীলার হাত দু'খানি ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল—আমায় আশ্বাস দাও, বল

দাও, বল বল তুমি আমার হইবে—সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আরও কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময়ে লীলা তাহার হাত ছিনাইয়া দৃঢ়স্বরে উচ্চকণ্ঠে কহিল—

"অমল বাবু আমাকে ক্ষমা করিবেন, ভালবাসা জিনিষটা চিরদিনই মানুষের প্রার্থনীয়, সকলেই ভালবাসা চাহে, আপনি আমাকে ভালবাসেন এ আনন্দের কথা, কিন্তু আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনি যে ভালবাসার কথা বলিলেন—আমি তাহার জন্য কোনদিনই প্রস্তুত নই এবং তাহার প্রতিদানের ক্ষমতাও আমার নেই।"

"কেন নাই? সে কথাটা কি আমি জানিবার অধিকারী হ'তে পারি না?"

"আপনি কি আপনার জীবনের সব কথা আমাকে বলতে পারেন?"

অমল এখানে একটু সমস্যায় পড়িল। তাহার জীবনের সব কথাত কাহাকেও বলা যাইতে পারে না এবং সে কথা যে লীলার অজ্ঞাত নহে তাহাও সে জানিত, তাই অকপটে কহিল—"সে কাহিনী শুনিয়া তোমার কি লাভ? তাহাত মসীময় কলঙ্করেখা মাত্র।"

"তাহাই যদি হয় তাহা হইলে আপনি কি করিয়া একজন ভদ্র মহিলার কাছে এরূপ প্রস্তাব করিতে অগ্রসর হইলেন? আপনার চঞ্চল মন কয়দিনের জন্য একজনের মোহে আবদ্ধ থাকিবে? মানুষ পাপের পথ হইতে এত সহজে ফিরিয়া আসিতে পারে, সে বিশ্বাস আমার নাই।"

"এ কথার কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে বা আমার নির্দ্দোষিতা

জানাইতে আমি আপনার নিকট আসি নাই, সে কথা আপনার বাবা জানেন, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে মানুষ ইচ্ছা করিলে সব পারে, ভাল মন্দ দোষগুণত সব নিজের হাতে।"

লীলা কহিল—"ক্ষমা করিবেন অমল বাবু, এত কথার আমার কোনও প্রয়োজন নাই—আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না, সে জন্য দুঃখিত, চলুন, বাবা অনেকক্ষণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" এইরূপ কহিয়া লীলা উঠিবার উপক্রম করিতেই অমল তাহাকে বাধা দিয়া ঝড়ের মত বেগে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া কহিল—"না—না লীলা তা হ'বে না, তোমার মানা আমি শুনবো না, তুমি আমাকে যত অযোগ্য, যত নিন্দিত চরিত্র বলে মনে কচ্ছো আমি তাহা নই, আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কচ্ছি, আমি তোমার যোগ্য হ'তে চেষ্টা করবো।"

লীলা উত্তেজিত ভাবে হাত ছিনাইয়া লইয়া কহিল—"যে অপদার্থ স্ত্রীলোকের সম্মান রাখ্‌তে জানে না সে নারীর প্রেমের যোগ্য নহে।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি সে হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অতি দ্রুত চলিয়া গেল।

অমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তারপর অনুচ্চ স্বরে কহিল—"এত তেজ, এত অহঙ্কার! একদিন নিশ্চয় তোমার এ গর্ব্ব চূর্ণ করবো। উঃ জীবনে নারীর কাছে এই আমার প্রথম ও শেষ অপমান। যে প্রতিহিংসা, যে হীন প্রবৃত্তিগুলি কুণ্ডলী পাকাইয়া মুখ লুকাইয়া তাহার অন্তর-বনে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আজ এক সঙ্গে তাহার জড়তা দূর করিয়া জাগিয়া উঠিল। এমন

করিয়াই মানুষের মনের মধ্যে সয়তান আসন গাড়িয়া বসে। আজ বহুকাল পরে সে সয়তান অমলের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল।

* * * *

অরুণা অসুখের ভাণ করিয়া বাড়ীতে পড়িয়াছিল—তাহার অজানাও আর কিছুই ছিল না। অমল যে কলিকাতা হইতে ওয়ালটেয়ারে শুধু তাহার দিদির হৃদয়ের সন্ধানেই ছুটিয়া আসিয়াছে তাহা সে জানিত। জানিয়া শুনিয়াই সে অমলকে ভালবাসিয়াছিল। অরুণা আর যাহাই হউক সংসারানভিজ্ঞা ছিল না; লোক-চরিত্র বিষয়েও তাহার জ্ঞান লীলার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। লীলা ও বরদা বাবুর সহিত আজ সে ইচ্ছা করিয়াই যায় নাই, আর অমলের কোনও বিষয় সম্পর্কে সে তাহার দিদির সম্মুখীন হইতেও সম্পূর্ণ নারাজ। তাহারা দুই জনে চলিয়া গেলে বহুক্ষণ পরে অরুণাও বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বারান্দায় আসিলেই বেয়ারা তাহার সম্মুখে সেদিনকার ডাকের চিঠি উপস্থিত করিল। কয়েকখানা তাহার পিতার নামের—দুইখানা তাহার নিজের কলেজের সহপাঠিনীরা লিখিয়াছে, আর একখানা বড় দামি এন্‌ভেলাপে কে যেন তাহার দিদির নিকট চিঠি লিখিয়াছে। ঐ চিঠিখানার খামের এ পিট ওপিট উলটাইয়া সে দেখিল ঐ চিঠিখানা জব্বলপুর হইতে আসিয়াছে। জব্বলপুরেত তাহাদের কেহ নাই, অন্ততঃ সে এমন কাহাকেও জানে না। বাহিরে না যাইয়া সে চিঠিখানা লইয়া নিজের শয়নকক্ষে গেল এবং কৌশলে উহা খুলিয়া ফেলিল। চিঠিখানি

দীর্ঘ, উহাতে এমন অনেক কথা আছে যাহার অর্থ অরুণা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তবে সে এইটুকু উদ্ধার করিল যে, যে বিজয় বাবু দিদিকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিল এ তাহারি লেখা। বিজয় যাহা লিখিয়াছে তাহার মর্ম্ম এই—"ওয়ালটেয়ার ছাড়িয়া নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে আমি এইখানেই জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম। বাঙ্গালা দেশ হইতে ইহা অনেক দূরে, অথচ ইহা বাঙ্গালীর সহিত সম্পর্ক বিরহিত নহে। তবে বাঙ্গালীর সংখ্যা বড় বেশী নাই, যাঁহারা এখানে আছেন তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী নহেন। হৃদয়বান্ মহাত্মা লোক। শুনিয়া সুখী হইবেন এই তিন মাস মধ্যেই এখানকার ব্রজবাবুর কৃপায় ব্যবসাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।" ইত্যাদি আরও কত কি।

অরুণা এই সামান্য সূত্রটুকু হইতেই অনেক কথা বুঝিয়া লইল। অন্ধকারের ভিতর হইতে তাহার প্রাণে আশার বাতি জ্বলিয়া উঠিল। এইবার অমলকে বুঝিতে হইবে বৃথা তাহার উদ্যম। সে খানিকক্ষণ ভাবিল আবার তাড়াতাড়ি কাপড় গুছাইয়া লইয়া চিঠি খানি বন্ধ করিয়া লীলার টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাত্রি হইয়াছে, পথে, বিশেষ সমুদ্রের ধারে তেমন লোক জন নাই, সে একাকিনী পথ চলিতে সুরু করিল। খানিক দূর চলিয়া একটা উচু যায়গায় উঠিতেই সে তু'জনের কথা শুনিতে পাইল। সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল অমল ও লীলা পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতেছে। সে অতি সন্তর্পণে সেখানে বসিয়া উৎকর্ণভাবে তাহাদের কথোপকথন

শুনিতে লাগিল। আগের কথা শুনিবার সুযোগ তাহার হয় নাই। লীলা যখন গর্জ্জন করিয়া বলিল 'যে অপদার্থ নারীর সম্মান রাখিতে জানে না, সে নারীর পবিত্র প্রেমের অযোগ্য !"

তখন তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল, অলক্ষ্যে তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল 'কেমন জব্দ'!' কেমন জব্দ!' আজ অরুণার তাহার দিদির উপর অনেক বেশী শ্রদ্ধা হইল। এই ত নারী, এই ত তেজস্বিনী। যে তাহার দিদি হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা। অমল মানুষ চেনে না—ভালবাসা বোঝে না। মূর্খ অন্ধ বধির সে, যদি তাই না হইবে তাহা হইলে সে উপেক্ষিত হইতে যাইবে কেন? যে বিপদের আশঙ্কায় তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, আজ কি না সেই আশঙ্কা হইতেই তাহার প্রাণে আনন্দ সুধার বিকাশ হইল। অরুণার এই অলখা গতি অমল ও লীলা বা অপর কেহই জানিতে পারিল না।

কুড়ি

পূজায় হাইকোর্ট ছুটি হইয়াছে, শচীন্দ্রনাথ সপরিবারে পুরীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। সঙ্গে কমলা, ইন্দিরা ও রাধাকান্ত বাবু। শচীন্দ্রনাথের বন্ধু মন্মথ মুখার্জ্জি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। কিন্তু তাহার ভাগ্যলিপি বিধাতা সৌভাগ্যের চিহ্নে এখনও অঙ্কিত করেন নাই। সে বিলাত হইতে আসিয়া পিতামাতার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবেই ব্যবসা করিয়া কোনরূপে নিজের জীবিকা

চালাইতেছে। সে অবিবাহিত ; বিবাহ করিলে যে ব্যয়টা বাড়িয়া যায় সে জ্ঞান তাহার পূর্ণমাত্রায় ছিল, বিশেষ তেমন পয়সাওয়ালা শ্বশুরও সে বড় একটা খুজিয়া পাইতেছিল না। বিলাত ফেরত নামে সমাজ যে নাসিকা কুঞ্চিত করেন সে এই শ্রেণীর লোক লইয়া ইহারা স্বদেশ ও সমাজকে গণ্য করিতে রাজি নহেন, পূরামাত্রায় সাহেবী ও বিলাসিতা এক কথায় পাশ্চাত্য জাতির বিলাস ব্যসনের যতগুলি দোষ প্রকৃত মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়া তুলিতে পারে এ সকলি মন্মথের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। বাল্যের বন্ধু, সহাপাঠি কেহ দেখা করিতে আসিলেও সে ইংরেজী ছাড়া কথা কহিত না,—আর তাহাকে মুখার্জ্জি সাহেব না বলিলে—ডুয়েল লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইত।

এ হেন মন্মথ শচীন্দ্রের অতিথিরূপে দেখা দিয়া সেদিন তাহাদের পুরীর বাড়ীতে আসিয়া পঁহুছিল, সেদিন রীতিমত একটা ঘটা পড়িয়া গিয়াড়িল। মন্মথ ও শচীন্দ্রের মধ্যে বন্ধুত্ব একটু গাঢ়রূপেই ছিল, উভয়ে বিলাতে একই ল্যাণ্ডলেডির বাসায় থাকিয়া ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়াছে। শচীন্দ্র যেমন পড়াশুনায়ই সময় কাটাইত মন্মথ সেরূপ কাটাইত না, সে বাইরের দশটা সংবাদ রাখিত, দু'চারিটি ইংরেজী প্রেমের গান শিখিয়াছিল, হাস্য পরিহাসে সে সুদক্ষ ছিল,—গল্প বলিতে যে বাস্তবিকই সাতিশয় নিপুণ ছিল। ভোজের ব্যাপারে মন্মথকে ছাড়িয়া দিলে—সে একাই নানা দেশের নানা আজগুবি গল্প করিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত। কাজেই তাহার আগমনে অন্য কাহারও হউক বা না হউক শচীন ও তাহার স্ত্রী প্রীতিবালা অত্যন্ত আনন্দিত

হইয়াছিল। ছুটির অবসর সময়টা আনন্দে কাটিয়া না গেলে তাহাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা হইল বলিয়া কোনরূপেই ত মনে হইতে পারে না। মন্মথের আসিবার পর দুই দিনের মধ্যেই এ পরিবারের যাহাদের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না তাহাদের সহিতও একে একে পরিচয় হইয়া গেল। মন্মথ সুরসিক ও সুপুরুষ। সেদিন নৈশভোজের পব সকলে ড্রইং রুমে বসিয়াছেন,— প্রীতিবালা পিয়ানোর পাশে বসিয়া অতিথির অনুরোধে গান করিতেছেন। রাধাকান্ত বাবু বহুক্ষণ হইল উপরে চলিয়া গিয়াছেন। মন্মথ ও শচীন্ দুই জনে সিগারের ধোঁয়ায় কক্ষটী সমাচ্ছন্ন করিয়া মৃদুস্বরে দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও যতকিছু আবশ্যক ও অনাবশ্যক তর্ক লইয়া সময় কাটাইতেছিল। তাহাদের কানে প্রীতি-বালার স্বরলহরী কতদূর প্রবেশ হইতেছিল তাহা বিধাতাই জানেন। কমলা ও ইন্দিরা দুইজনে একখানি সোফার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সহসা প্রীতিবালা ঘাড় ফিরাইয়া কোপ কটাক্ষে কহিল, বেশত গান শোনা হচ্চে, আমি মরলুম চেঁচিয়ে, আর তোমরা দিব্যি দু'জনে চুরটের ধোঁয়া উড়াচ্চ, খুব ভদ্রলোক যাহ'ক !'

মন্মথ—লজ্জিতের ভাণ করিয়া কহিল—"ক্ষমা করবেন মিসেস চৌধুরী, বাস্তবিক আমরা তন্ময় হয়ে শুনছিলুম, কি মিষ্টি আপনার কণ্ঠ ! চমৎকার।'

শচীন উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল—'মুখার্জ্জি'—যা'ক তবু তুমি আমাদের মান বাঁচিয়ে দিলে ! নাগো না—আমরা তোমার গানের সুরে সুরে সত্যসত্যই গল্পটাও বেশ জমিয়ে তুলেছিলুম।'

"যাও যাও আর বাহাত্তরী করতে হবে না। আমি আর গাইতে বল্লেও কখখনো গাইব না।"

"সে কি করে হয় প্রীতি?"

কমলা হঠাৎ অতর্কিতভাবে কহিল—তা দাদা ঝগড়া করে কি লাভ? তার চেয়ে মিঃ মুখার্জ্জি কেন একটা ইংরেজী সুর আমাদের শুনিয়ে দিন না।

"শচীন্দ্র উল্লাসে চীৎকার করিয়া মন্মথের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল—সুন্দর প্রস্তাব। ঠিক্ বলেছ কমলা।"

মন্মথ কহিল—"আমি আবার গাইতে জানি নাকি? আর বিশেষ ওঁদের কাছে কি গাইব বল? বেচারাকে আর কেন লজ্জা দিচ্ছ?"

প্রীতি কহিল—"যান্ যান্—ঢের জানা আছে, এইবার আসুন।"

মন্মথ সপ্রতিভ ভাবে কহিল—"এমন করে কি কেউ কোনও ভদ্রলোককে লজ্জা দিতে হয়? তা কি করবো বল, তোমরা যখন কোন রকমেই রেহাই দিচ্ছ না, তখন আর কি করা যায়, দোহাই তোমাদের গান শুনে যেন আবার কেউ পালিও না। মন্মথ পিয়ানোর সুরে ঝঙ্কার দিয়া একটী ইংরাজী হাঁসির গান গাহিল—

এমনি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর সহিত হাস্য কৌতুকের সহিত গানটী গাহিতেছিলেন এবং প্রীতিবালার প্রতি কটাক্ষ করিতে ছিলেন যে তাহার পক্ষে হাস্য দমন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। গানের শেষে শচীন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"কি কচ্চ মন্মথ,—একেবারে যে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি করে দিচ্ছ। প্রীতি ত রেগে গেছে।"

"যাও যাও আর ঠাট্টা করো না,—কি সব গান, যেমন তার রচনা, তেমনি তার সুর।' প্রীতিবালা সত্যসত্যই প্রীতি ও সোহাগের সুরে এই কথা কয়টি কহিল। রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছিল—কাজেই গানবাজনা সেদিনকার মত সেখানেই ক্ষান্ত রহিল। মহিলারা একে একে সকলেই উপরে চলিয়া গেলেন। দুই বন্ধুতে গল্প সুরু হইল। মন্মথ কহিল—"শচীন্ তোমার মত ভাগ্যবান লোক সংসারে অতি 'বরল।' শচীন কহিল—'কেন?' 'কথাটা সরল সহজ, তোমার বাবা সেকেলে লোক হয়েও নব্য ভাবে তোমায় শিক্ষিত করে এনেছেন, তারপর তোমার স্ত্রী ভগ্নী সকলেই শিক্ষিতা, পুরুষ ও নারী তুল্য ভাবে শিক্ষিতা না হলে সে পরিবারের যে কি কষ্ট তা তুমি কি করে বুঝবে বল?"

শচীন ইহাতে মনে যে মনে খানিকটা গর্ব্ব অনুভব করিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সে কহিল—"ভাই এজন্য আমি ঈশ্বরের নিকট সতত কৃতজ্ঞ।"

মন্মথ কহিল—"তোমার ভগ্নী দু'জনের বিবাহ হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"একজন মানে আমার ছোট বোন্ ইন্দিরার স্বামী প্রফেসর। সে বেশ সুখশান্তিতেই আছে। কিন্তু কমলার জন্যই আমাদের বড় কষ্ট।"

"কেন কেন?"

"বাবা, দরিদ্রের ঘরের ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর

ইচ্ছা ছিল যে কমলার স্বামী আমাদের এখানেই থাকবে কিন্তু সে হ'য়ে উঠলো না ; বাবার সঙ্গে আমার ভগ্নীপতি বিজয়ের বাবার ঝগড়া হলো, সে ঝগড়ার মাত্রা এমনি বেড়ে গিয়েছে যে যতদিন কমলার শ্বশুর বেঁচে ছিলেন ততদিন কমলা কোনদিন শ্বশুর বাড়ী যায় নাই, বিজয়ের বাবার মৃত্যুর পর বিজয়েরও আজ এই কয় বছর হলো কোন সন্ধান মিলছে না, সে জীবিত কি মৃত সে সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না। মা সেই শোকেই হঠাৎ চলে গেলেন। বাবা কিন্তু বিজয়ের জন্য কোন খোঁজই নেন না, আমার কাছে কিন্তু এটা আদৌ ভাল মনে হচ্ছে না, কিন্তু কি করি বল।"

"কমলা কি এজন্যে তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট নন ?"

"না হে না, সে বাবার বড় আদুরে মেয়ে,—সে বাবার জন্য—বাবার সম্মানের জন্য সব করতে পারে। আর ওদের দু'জনের ভিতর খুব একটা গভীর ভালবাসা হবার সুযোগও হয়নি ! এই জন্যে প্রীতিও বড় দুঃখিত, কিন্তু কিন্তু কি করবো।"

"তবে নিশ্চয় জেনো বিজয় বাবু বেঁচে নাই, বেঁচে থাকলে কি আর কোন পুরুষ এমন সুন্দরী শিক্ষিতা যুবতী স্ত্রীর মোহ দূর করে ঠেলে ফেলে দিয়ে দূরে সরে থাকতে পারে ?"

"বিজয় মারা গেছে বলেত আমার মনে হয় না, তার মত পিতৃ-ভক্ত আজকালকার দিনে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না, আমার মনে হয় তার বাবার অপমানকেই সে বড় করে ধরেছে,—কি জান মন্মথ, এটাই আমাদের পরিবারের মধ্যে মস্ত বড় একটা ট্র্যাজিডি।"

"বাস্তবিক এটা বড় sad, ব্যাপার হে। সত্য কথা বল্‌তে কি কমলার ন্যায় সুন্দরী ও শিক্ষিতা মহিলা সমাজের গৌরব।"

"হ্যাঁ! তবে কি জান—বিধাতা কোন মানুষকেই নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী করেন না, আমাদের পরিবারে অর্থের অভাব নেই—সুখশান্তির ব্যথা কি তা আমরা কোন দিন জানিনি, মা মরার পর থেকে, আর কমলার এই কষ্টটা, কমলা নিজে খুব বড় বেশী মনে না কর্‌লেও প্রীতি ও আমি খুব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। কিন্তু জানিনা বাবা কেন যে এ ব্যাপারে এত উদাসীন,—হাজার হউক মেয়ে ত। হায়, আজ যদি মা বেঁচে থাকৃতেন তা হ'লে কথনো এমনটা হ'তে পার্‌ত না।"

আর তাহাদের কথা অনেকদূর অগ্রসর হইল না। শচীন্দ্রনাথ মন্মথকে তাহার শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিয়া উপরে শয়ন করিতে চলিয়া গেল।

মন্মথ শোবার ঘরের দরোজা বন্ধ করিয়া কাপড় ছাড়িয়া খানিক-ক্ষণ ইজিচেয়ারের উপর অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। কিন্তু সারারাত্রি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না—শচীন্দ্রের সর্ব্বপ্রকার সুখশান্তির হিংসা তাহার প্রাণে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগিল। সে তন্দ্রাঘোরে দেখিল সুবেশা—সুকেশা কমলা তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছে 'ওগো নিষ্ঠুর! ওগো প্রিয়তম! আমি যে তোমাকেই চাই!

একুশ

শীতের প্রভাতের রক্তরাঙ্গা রবি সবে মাত্র সমুদ্রে স্নান করিয়া আকাশের খানিকটা উপরে উঠিয়াছেন; তরুণ তপনের গোলাপী আভা তখনও জল করিয়া মুছিয়া যায় নাই। সমুদ্র স্নান রত নর-নারীর দল তখনও সকলে স্নান শেষ করিয়া ঘরে ফিরে নাই। সেই ভোরে সমুদ্র স্নান শেষ করিয়া এলায়িত কুন্তলা সুবেশা দুই ভগ্নী কমলা ও ইন্দিরা চায়ের আয়োজন করিতেছিল। প্রীতিবালা উপরের ঘরে ভৈরবীর একটা সুর বাজিতে ছিল। রাধাকান্ত বাবু এ সময়ে নীচে নামিয়া আসিয়া চায়ের টেবিলে যোগদান করিলেন।

রৌদ্রের সোণালি ছটা উন্মুক্ত জানালা পথে আসিয়া ঘরের চারিদিকে হাসিতেছিল। টেবিলের চারি পাশে সকলে আসিয়া জড় হইয়াছেন। সম্মুখে প্রসারিত অনন্ত নীল সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাধাকান্ত বাবু কহিলেন—"শচীন দিন কয়েকের জন্যে একবার ঘুরে আসি, আর চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় না।"

কমলা সকলের সম্মুখে চা ঢালিয়া দিতেছিল, তাহার এলায়িত কেশপাশ লাল রংয়ের সাড়ীর উপর দিয়া পিঠের এ পাশে ওপাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার খানিকটা বুকের আঁচলের দিক দিয়া সাপের ফণার ন্যায় বক্র গতিতে তাহার গতিভঙ্গীর সহিত দুলিতেছিল। মন্মথ অবাক্ দৃষ্টিতে কমলার দিকে চাহিয়াছিল, কমলার সুগোল নবনীত-কোমল সুগৌর হস্ত প্রকোষ্ঠের সোণার চুড়িগুলির ঝিনিকি ঝিনিকি রিণিকি রিণিকি রবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণের

তারে কে যেন বড় করুণ কোমল সুরে আকাঙ্ক্ষার তীব্র বাসনা ঝঙ্কৃত করিয়া দিতেছিল। মন্মথ একদৃষ্টে সেই রূপলহরী নিরীক্ষণ করিয়াছিল; তাহার এই নির্লজ্জ দৃষ্টি কমলার চক্ষু এড়াইল না—বরং সেও কৌতূহলভাবে এমনি একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল যাহাতে পূর্ণরূপে কামনার বহ্নি জ্বলিয়া মুগ্ধ পতঙ্গকে অতি তীব্রভাবে—অতি চঞ্চলভাবে নিকটে আহ্বান করিয়া লইল।

রাধাকান্ত বাবুর কথায় শচীন্দ্র কহিল "আপনি কি করে এ সময় যাবেন,—শরীর যে মোটেই ভাল নয়, কয়েকটা দিন অন্ততঃ আমাদের ছুটির কটা দিন, এখানে থেকে সুস্থ সবল হয়ে যান না?"

প্রীতি স্বামীর কথায় সায় দিয়া কহিল—"কখ্খনো হ'বে না বাবা, তোমাকে কোন মতেই ছেড়ে দোব না, তা'হলে আমাদের সব আনন্দ যে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।" কমলা ও ইন্দিরা সেই সুরে ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"তা হ'তেই পারবে না, দেখ্বো তুমি কেমন করে আমাদের ছেড়ে যাও।"

মন্মথ কহিল—"আমি অতিথি – তা আপনি চলে গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

এত বাধার উপর আর কোন কথা চলে না। কাজেই রাধাকান্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে শচীন্দ্র প্রস্তাব করিল যে—"তার চেয়ে চলুন না আমরা খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে গিয়ে বনভোজন করে আসি। বেড়ানও হবে—সঙ্গে আমোদ, শিকার, ছুটাছুটি সবই চল্‌বে।

কতবার পুরী এলুম, কিন্তু যাই যাই করে আর যাওয়াই হল না, শুনেছি সেখানে দেখবার অনেক জিনিষ আছে।”

মন্মথ কহিল—বেশ, বেশ, আমার হ্যাণ্ডক্যামারাটাও নিয়ে যাবো, খানকয়েক ছবিও তোলা যাবে, কি বলেন মিসেস্ লাহিড়ী?” কমলা এই অতর্কিত সম্ভাষণে একটু চমকিয়া উঠিল, তাহার কপোল রাঙ্গা হইয়া গেল। কই এতদিন ভুলেও ত কেহ তাহাকে তাহার স্বামীর পরিচয়ে কোন সম্ভাষণ করে নাই। সেও ত কোনদিন ভুলেও তেমন গম্ভীর ভাবে তাহার স্বামীর কথা স্মরণ করে নাই।

সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল—“বেশত।”

ইদানীং রাধাকান্ত বাবু বড় বেশী কথাবার্ত্তা বলিতেন না। মাথাটা একটু দোলাইয়া বলিলেন,—“তা তোমার প্রস্তাব মন্দ নয়; বৌমা, কাল ভোরের প্যাসেঞ্জারে যাওয়াই ভাল। কেমন? কাল সেখানেই থাকা যাবে, শুনেছি সেখানকার ডাকবাংলাগুলিও ভাল।

আনন্দের সহিত কমলা বলিয়া উঠিল,—“হ্যাঁ বাবা।”

তৎক্ষণাৎ কেহ বাজারে ছুটিল, কেহ ডাক্‌বাঙ্গালার বন্দোবস্তের ভার লইল, কেহ পাল্কী বেয়ারার সন্ধানে চলিল, মোট কথা আয়োজনের ব্যবস্থাটা তন্মুহূর্ত্তেই সুরু হইয়া গেল।

বাইশ

সমুদ্রের ধারে ঝড়ের সিগ্‌নাল দেখিয়া মন্মথ কহিল—“তাইত হে শচীন, শেষটায় একটা ঝড়ের হাঙ্গাম দেখাও অদৃষ্টে জুটে গেল। সমুদ্রের তাণ্ডব নর্ত্তন একটা দেখ্‌বার জিনিষ বটে।”

"ভাল, কিন্তু নিজে বিপদে না পড়ে। মনে কর যারা এ সময়ে জাহাজে থাক্‌বেন তাদের অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াইবে। ক'দিন যে রকম আকাশটা মেঘে ঢেকে আছে, আর যে রকম জোরে বাতাস বইছে, ঘর থেকে বেরুতে আর ইচ্ছেই হয় না।"

"একেবারে চুপ্ করে বসে থাকাও বিড়ম্বনা।'

দুই বন্ধুতে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করিতেছিলেন। হাইকোর্ট খুলিবার আর অল্প বাকী! মন্মথ ইতি মধ্যে দুই তিনবার যাইবার জন্য কি না আস্ফালন করিয়াছে; কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত হয় নাই, পরিবারের সকলেই বলিয়াছেন, তা আর কটা দিনই বা আছে, সকলে এক সঙ্গেই যাব। বিশেষ মিসেস্ লাহিড়ীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সে কোন রূপেই এড়াইতে পারে নাই। মন্মথ নিজে বুঝিত যে তাহার কমলার প্রতি অস্বাভাবিক প্রীতির ভাব যদি কোনরূপে প্রকাশ পায় তাহা হইলে বড়ই অন্যায় হইবে। একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে, অথচ তাহার প্রতি তাহার কেন এই অন্যায় আকর্ষণ? ইন্দিরার স্বামী হঠাৎ আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলে পর মন্মথ ও কমলার গল্পের সুযোগ ও সময় বেশ অসম্ভাবিত-রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রীতিবালা ও শচীন এ সকল দিকে কোন দিনই লক্ষ্য করিতেন না। রাধাকান্ত বাবু দিন দিনই যেন কেমন হইয়া যাইতেছিলেন, অনেক সময় কোন কথাবার্ত্তাই বলিতেন না, কোন কোন সময়ে তিনি ব্যথিত কণ্ঠে কমলাকে বলিতেন— "মা তোর প্রতি কি আমি বড় অন্যায় করেছি?" তাঁহার আগের ক্রোধ ও অভিমান দিন দিনই কমিয়া আসিতেছিল। কমলা কহিল

"কেন ও কথা নিয়ে চিন্তা কচ্ছেন, আপনার চেয়ে সংসারে আর কে আমার আপনার আছে বাবা ?"

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই ঝড়ো হাওয়া উন্মাদের মত সমুদ্র সিকতার বালুকারাশি উড়াইয়া দিয়া বেগে বহিতেছিল,—ঢেউগুলি প্রবল মাতামাতি করিয়া তীরে আসিয়া আঘাত করিতেছিল। বর্ষণও যেমন প্রবল, বাতাসও তেমনি জোরে বহিতেছিল। কমলার কাছে আজ কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, ইন্দিরা চলিয়া যাওয়ার পর তাহার সময় কাটান দায় হইয়া উঠিত। রাধাকান্ত বাবু আজ দু'দিন যাবত একটু অসুস্থ, রাত্রি আটটা না বাজিতেই শুইয়া পড়িয়াছেন। শচীন্ ও প্রীতি চা খাইয়া সেই যে উপরে গিয়াছে আর নীচে নামে নাই। কমলা খানিকক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল মিঃ মুখার্জ্জি একাকী ইজিচেয়ারের উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পড়িয়া চুরুট টানিতেছিল, সাম্‌নের ছোট টি্‌পয়ের উপর চায়ের পেয়ালাটা পড়িয়া আছে, খবরের কাগজখানা মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। কমলার পায়ের শব্দ শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"এই যে মিসেস লাহিড়ী, কি মনে করে ? আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি আপনারা সকলেই অতিথিকে ভুলে গেছেন ?"

কমলা একখানা চেয়ার টানিয়া বসিতেই মুখার্জ্জি বিপরীত দিকের কৌচে বসিয়া পড়িল। কমলা কহিল—"কেন দাদা ও বৌদিদি ত অনেকক্ষণ এখানেই ছিলেন, আমি বাবার ঘরে ছিলুম, তিনি এই একটু ঘুমিয়েছেন, আমারও একা একা চুপ করে বসে থাকৃতে ভাল লাগ্‌ছিল না, তাই চলে এসেছি। তাঁরাও এলেন বলে।"

"এমন বাদ্‌লার দিনে কপোত কপোতী দু'টীর শান্তির নীড় ভেঙ্গে দিতে চাইনে।"

"সেজন্যে তাঁরা নিশ্চয়ই আপনাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

"আচ্ছা মিসেস্ লাহিড়ী আপনি কি বরাবরই পুরীতে থাকেন?

"কেন?"

"এম্‌নি।"

'না, আমরা কল্‌কাতাতেই অনেকটা সময় কাটাই, তবে মাঝে মাঝে দেশেও যাই, পুরীতে শুধু এসময়টা বরাবরই বেড়াতে আসি।'

মন্মথের এ সকল প্রশ্নে কমলা মনে মনে একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করিতেছিল। সে কহিল—'এ সকল কথা জিজ্ঞেস কচ্ছেন কেন মিঃ মুখার্জ্জি?"

'কি বল্‌বো মিসেস্ লাহিড়ী আপনাদের আদর আপ্যায়নে যে আমি কতদূর কৃতার্থ হ'য়েছি, সে কথা কোন মতেই বলে বুঝাতে পার্‌বো না।"

"কি যে আপনি বল্‌ছেন, অবাক্ কল্লেন, অতিথি দেবতা জানেন ত? কিই বা আর আপনাকে আমরা করেছি, কিছু না! বরং আপনি যে বন্ধু বান্ধবদের কাছে আমাদের যথেষ্ট নিন্দা কর্‌বেন, তার নানা দিক্ দিয়া নানাভাবেই দিব্য সুযোগ করে দিয়েছি।"

"এ কেবল আমাকে লজ্জা দেওয়া বইত নয়?" আপনি বাস্তবিক শিক্ষিতা মহিলাদের আদর্শ স্থল, বিলেত ছাড়া দেশে এসে আমি এমন ভালবাসা, আদরও কোথাও পাইনি। আর আপনার কথা, কোন মতেই ত ভুল্‌তে পারবো না, মিসেস্ লাহিড়ী।" একথা

কয়টি বলিতে যাইয়া তাহার কণ্ঠ যেন কেমন রোধ হইয়া আসিতেছিল, কমলা একথায় একটু বিগলিত স্বরে কহিল—"তা, আপনার যথেষ্ট সৌজন্য, আপনিত আমাদের পর নন্, দাদার বন্ধু, ঘরেরি লোক, বাবা বল্‌ছিলেন, মন্মথ ছেলেটিকে বড়ই ভাল বোধ হচ্চে। আপনার ব্যবহারে বাবা খুব খুসী।"

কমলা ও তাহার স্বামীর মাঝখান দিয়া যে একটা ব্যবধানের নদী মিলনের অন্তরায় করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, মন্মথের তাহা অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু কমলা জানিত না যে সে কথা অতিথির কর্ণ গোচর হইতে বাকী নেই। এ কয়টা দিন খুব স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করিতে করিতে উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়ের আলোচনাই তেমন লজ্জাজনক বলিয়া মনে হইত না। কমলা হৃদয় হইতে যে প্রেম ও ভালবাসাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত ছিল, যৌবনের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও কামনার মাঝখানে তাহা দিন দিনই যে খুব অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল, সে সময়ে সময়ে স্বামীর কথা যে না ভাবিত তাহা নহে, কিন্তু সে বড় শ্রদ্ধার সহিত নহে। কেমন যে একটা অস্বাভাবিক ঘৃণা আসিয়া তাহার হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছিল সে তাহার কারণ কোন রূপেই সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

এক পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলের সহিত তাহার ন্যায় রূপসী ও বিদুষী রমণীর বিবাহ হইয়াছে, সত্যটাকে মনে করিয়া তাহার প্রাণ অপমানের তীব্র জ্বালায় নির্য্যাতিত হইয়া উঠিত। সে কোনরূপেই এই অন্যায়কে দূর করিয়া স্বামীর পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে

স্থান দিতে পারে নাই। চারিদিকে ঐশ্বর্য্য, চারিদিকে বিলাসিতা, চারিদিকে উন্মাদনার চটুল চঞ্চলে নৃত্যভঙ্গী ইহার লোভনীয় আক্রমণ হইতে আপনাকে মুক্তি করা কি বড় সহজ!

কমলা মনে মনে ভাবিতেছিল—"কেন তাহার এ পতন? এই মুখার্জি সাহেবের ন্যায় রূপবান্ গুণবান শিক্ষিত ব্যক্তি কি তাহার স্বামীর আসন গ্রহণ করিতে পারিত না। এইরূপ কল্পনায়ও যে কত বড় অপরাধ তাহার নারী মর্য্যাদার উপরে ভীষণ বজ্রের ন্যায় জ্বালাইয়া পোড়াইয়া আঘাত করে—সে মীমাংসা করিবার শক্তি সে অনেকদিন হারাইয়াছিল। হঠাৎ মন্মথ কহিল—"মিসেস্ লাহীড়ী, আপনার সঙ্গে মিঃ লাহিড়ীর কতদিন হলো দেখা নেই?"

এই অতর্কিত প্রশ্নে কমলা কহিল—"কেন একথা জিজ্ঞেস কচ্ছেন মিঃ মুখার্জ্জি?" তাহার এই সুরে একটা বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

'না না অমনি,—তবে কি জানেন, আপনার ন্যায় স্ত্রীকে যিনি অবহেলা করতে পারেন, তিনি কখ্খনো শ্রদ্ধার যোগ্য নন্—বিলেত হ'লে—কমলা বাধা দিয়া কহিল—"তাঁর কি হত মিঃ মুখার্জ্জি?" "তার মত নরাধমকে আদালতের কাছে দণ্ডিত হ'তে হত। বিলিতি সমাজকে আপনারা যতই দোষ দেননা কেন, সে দেশে আইনের এমন মহৎ বিধান আছে, যাতে পুরুষ ও নারী তুল্য ভাবে সমাজে চলতে পারে।" "এ দেশটাত আর বিলেত নয়। সেটা যেন ভুলে যাবেন না।' মন্মথ একটু নীরব থাকিয়া কহিল—আপনি আপনার স্বামীর যে

নির্য্যাতন নীরবে সহ্য কচ্চেন, বিলাতের কোনও স্বাধীনা রমণী কখনো এরূপ ভাবে সহ্য করতেন না।"

'তিনি কি করতেন?"

'কেন, স্বামীকে পরিত্যাগ করতেন। পুনরায় নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাকে ভাল বাসতেন তাকে বিবাহ করতেন। পূর্ব্ব স্বামীর অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ তক্ষুণি হ'য়ে যেত। নারী কোন অংশেই পুরুষের চেয়ে হেয় নয়, পুরুষের অন্যায়কে সমাজ হেলা করবে, আর নারীর সামান্য ত্রুটিটীকেই কি খুব বড় করে দেখবে, সে যে বড় অন্যায় কমল!"

এই 'কমল' কথাটা একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত এমনি ভাবে মন্মথের মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল যে সেও কথা শেষ হইলে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া আর কমলার দিকে চাহিতে পারিতে-ছিল না। কমলা—কিন্তু মন্মথের এই 'কমল' সম্বোধনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া কহিল—'সে কি করে এদেশে সম্ভব হয় মিঃ মুখার্জ্জি?"

তুষের আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিলেও হঠাৎ যদি ইন্ধন পায় তখন সে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। মন্মথের মনে মনে যে আগুনে জ্বলিতেছিল, আজ তাহার ইন্ধন পাইয়া উহা সহসা এমনি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যে সে উন্মত্তের মত টলিতে টলিতে—

"তুমি আমার সহায় হও কমলা"—বলিয়া খপ্ করিয়া কমলার হাতখানি ধরিয়া ফেলিল। কমলা প্রথমটা সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়া-ছিল—এই অন্যায়ের গতি প্রতিরোধ করিল না, সে রুদ্ধ নিশ্বাসে

অতি মৃদুস্বরে উদ্বসিত কণ্ঠে কহিল—"ছাড়ুন, ছাড়ুন, মিঃ মুখার্জ্জি তারপর জোরে মন্মথের হাত হইতে নিজের হাতটা ছিনাইয়া লইয়া উপরে ছুটিয়া চলিল, তাহার নয়ন সমক্ষে আগুণ জ্বলিতেছিল। পৃথিবী যেন পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছিল।

তেইশ

নরেন্দ্র বাবু বিমলা ও লীলাকে লইয়া পুরী চলিয়া গিয়াছেন। বরদা বাবুর একবার কলিকাতা যাওয়ার নেহাৎ দরকার উপস্থিত হইয়াছে, তাই তিনি অরুণাকে লইয়া দিন কয়েকের জন্য ওয়াল-টেয়ারে রহিয়া গেলেন।

আজকাল অমলের অনেকটা সময়ই বরদাবাবুর ওখানে কাটিয়া যাইত। লীলার কাছে আঘাত পাইয়া কিছুদিন তাহার রুদ্ধ হিংস্র প্রকৃতি উন্মত্তরোষে গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতেছিল। কিন্তু অমল সত্য সত্যই আর আগের অমল ছিল না, তাহার প্রকৃতি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। লীলা তাহাকে ভাল বাসেনি সে অপরাধ কাহার? বরদাবাবুর কি অরুণার কোন অপরাধ নাই। আর এই বরদাবাবুর ন্যায় সাধু ও সরল প্রকৃতির লোকত অতি বিরল। বাহিরের কুটিলতা পরিপূর্ণ পঙ্কিল জগত হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত—সংসার বাসী হইয়াও উদাসীন সন্ন্যাসী, এরূপ লোকের অন্যায় করিতে যাওয়ার কল্পনাও যে হৃদয় বিদারক। এইরূপ ধীরে ধীরে অমলের মত শুদ্ধ ও সংযত হইয়া সত্য সত্যই মহৎ ও উদারভাবে অলক্ষ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল।

অরুণা অমলকে অত্যন্ত আদর ও যত্ন করিত। তাহার এইরূপ প্রীতির আকর্ষণে অমল আর চুপ করিয়া বাসায় বসিয়া থাকিতে পারিত না। ভোর হইলেই সে বরদাবাবুদের চার টেবিলে যোগদান করিবার জন্য ছুটীয়া যাইত। আর দিন কয়েকের মধ্যেই তাহার কলেজ খুলিবে, অরুণাও বরদাবাবু চলিয়া যাইবার আয়োজন করিতে-ছেন; অমলও একসঙ্গে কলিকাতা ফিরিবে স্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার আর বড় বাকী নেই। বরদাবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। অমলের আজ আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। সে আসিয়া দেখিল অরুণা একমনে একখানা পুঁথি পড়িতেছে সে বারান্দায় ঢুকিয়া কহিল —"আজ যে আপান একলা বসে, বেড়াতে বের হন নি ?"

অরুণা চমকিত ভাবে উঠিয়া কহিল— "না আজ আর বের হ'বনা বলেই সংকল্প করে পড়া সুরু করেছিলুম।" বসুন অমল বাবু।' অমল ছড়িটা ও টুপিটা টেবিলটার উপর রাখিয়া কহিল—"আপনার বাবা কি এখনো ফেরেন নি নাকি ?"

"না, এই যে আধঘণ্টাও হ'ল না তিনি বেরিয়েছেন। আপনার চা খাওয়া হয়নি বুঝি ? 'বিহারা'—

অমল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল—"ব্যস্ত হ'বেন না, কোন দরকার নেই, তাইত আজ দেখ্‌ছি আর বরদাবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।'

"কেন ? তিনিত সন্ধ্যার পর আর বাইরে থাকেন না, বসুন না, না আপনার খুব জরুরি কাজ আছে বুঝি ?"

"কিছু না।"

"তবে বসুন না ? খানিকটা গল্প করা যাক্ ; যাই বলুন না কেন আর এ যায়গা ভাল লাগ্‌ছে না, কল্‌কাতা যাওয়ার জন্য প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে।" অরুণা মৃদু হাসির সহিত একটু অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া কহিল—"কই দিদিতে আর আপনাতে কি কথা হ'ল, আমাকে ত কিছু বল্‌লেন না। না সেকথা আমার শুনতে নেই ?" অমল বিস্মিত ভাবে অরুণার দুষ্ট চপল হাসির প্রতি বিদ্রুপ করিয়া কহিল "কেন ? আপনি কি জানেন না নাকি ?"

"সত্যি নয়। বিশ্বেস কচ্ছেন না বুঝি ?"

"ছিঃ মিস্‌রায় আপনিও কি আমায় ঘৃণা করেন নাকি ?"

অরুণা হাসিয়া কহিল—"মাপ করবেন অমল বাবু। আমি আপনাকে ব্যথা দেওয়ার জন্য কোন কথা বলিনি। সত্যি বলুন না কি হয়েছিল ?" চতুরা অরুণার কোন বিষয়েই অজ্ঞাত ছিল না, সে সুধু কৌশল করিয়াই সব কথা অমলের মুখ হইতে বাহির করিবার জন্য ঐভাবে প্রশ্ন করিতেছিল। অমল আর কোনও আপত্তি না করিয়া একে একে আনুপূর্ব্বিক সব ইতিহাস অরুণার কাছে বলিয়া ফেলিল। অরুণা নীরবে হতাশ প্রেমিকের ব্যথিত নিবেদন অতিশয় আগ্রহের সহিত শুনিয়া কহিল—"বাস্তবিক অমলবাবু, আপনার এই বেদনার জন্য আমরা খুব দুঃখিত। কিন্তু কেউত আর মানুষের মন্ বদ্‌লে দিতে পারে না। দিদি আপনাকে ভালবাসে না বলেই যে অন্য কোন রমণী আপনাকে ভালবাস্‌বেনা তাত নয়।"

সে ঠিক্, কিন্তু যেখানে ব্যথা, সেখানে অতি সামান্য আঘাত ও যে খুব বড় হ'য়ে উঠে।

"আপনি যে আগাগোড়া ভুল করে মায়া মরীচিকার মত ঘুরে আস্ছেন।"

"একথা কেন বল্ছেন মিস্রায় ?"

"কোনদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন ?"

'সে কথা বল্তে পারেন, কিন্তু বরদাবাবু আমাকে যে স্নেহের চক্ষে দেখে আস্ছেন, সে সৌভাগ্যে আমি যে কোন ব্যাপারই অসম্ভব বলে ভাবিনি।"

'তা সত্য, কিন্তু একথাও মনে রাখ্বেন অমলবাবু, নারী চরিত্র একেবারে জলের মত তরল নয়, দিদি কি আর কাকেও ভাল বাস্তে পারেন না ?"

অরুণার এই উক্তিতে অমল খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া কহিল "কেন পারবেন না ? "তাই কি ?"

"হ'তে পারে।'

অমল ব্যাকুল আগ্রহের সহিত কহিল—"আপনি কি কিছু জানেন ?"

'জানি একথা বলাও ঠিক্ নয় এবং জানিনা একথা বল্লেও সত্য বলা হয় না।"

"দোহাই আপনার হেঁয়ালি রেখে, সত্যি বলুন না, তাঁর ভালবাসার পাত্র কে ?" অমলের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অরুণা একে একে সমুদয় কথা এমন কি বিজয়ের চিঠির কথা পর্য্যন্ত এমনি আতরঞ্জিত ভাবে কহিল যে, অমলের কাছে সুস্পষ্ট অনুভূত হইল যে, লীলার জন্য সে যাহা কিছু করিয়াছে সে সকলি ব্যর্থ।

অরুণা অমলকে অন্যমনা দেখিয়া কহিল—"আমাদের এ অনুমান মিথ্যাও হ'তে পারে ত ?"

অমল দুঃখের সহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সত্য মিথ্যায় আর লাভ ক্ষতি কিছু নেই, মিস্ রায়। যে হৃদয়ে আমার স্থান নেই, সেখানে বৃথা আঘাত করলে কি লাভ বলুন ? আমি সব সইতে পারি কিন্তু অপমানের তীব্র জ্বালা কোনরূপেই হৃদয়ে বহন করতে পারি না।"

"এখন স্থির করেছি কি জানেন ! যদি কোথাও ভালবাসা পাই, যদি কাউকে দেখ্তে পাই আমার ব্যথার ব্যথী, সঙ্গের সঙ্গিনী, তাহ'লেই ধরা দোব, নইলে কালস্রোত যে দিকে গড়িয়ে নেয় চলে যাব। এই আমার সংকল্প—এই আমার পণ।"

অরুণা একটু বিদ্রুপের সুরে কহিল—"বেশত খুঁজে দেখুন না ?"

অমল হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল,—"আর খুঁজ্ছিনি, এবার চুপ করে বসে থাক্বো, যার দরকার হবে খুঁজে নেবে।" এরূপ সময়ে বরদাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদের তর্কস্রোত অন্যদিকে প্রধাবিত হইল।

চব্বিশ

সেদিন রাত্রে বরদাবাবু অরুণাকে কহিলেন—"অরুণা, আমার মনে হচ্চে, আমি আর বেশী দিন এ পৃথিবীতে থাক্বো না।"

অরুণা আন্তরিক বেদনাভরা ব্যথিত সুরে কহিল,—"একথা কেন বল্‌ছো বাবা ?"

"কেন যে বল্‌ছি, সে যদি তোরা একবার ভাব্‌বার বলেও মনে করতিস্ তাহ'লে আর দুঃখ কি ছিল ?"

আজ একথা কেন বলছো, কই তুমিত কোনদিন আমাদের উপর বিরক্ত হওনি, কিছু কি অন্যায় করেছি ?"

"তা নয়, তবে কি জানিস্—তোদের যদি একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারতুম, তাহ'লে প্রাণে যে কত বড় শান্তি হ'ত, সেত আর তোদের ভাব্‌বার জিনিষ নয়। এই যে লীলা অমলকে"—

অরুণা বাধা দিয়া কহিল,—"এ ব্যাপারেত দিদির কোন দোষ নেই, আর অমলবাবুর প্রতি তুমিও ত কখখনো সদয় ছিলে না বাবা, "আমি এজন্যে দিদিকে বিন্দুমাত্রও দোষ দিই না।" বরদাবাবু একটু ক্রোধের সহিত কহিলেন,—"তবে কি তুমি বল্‌তে চাও সব দোষ আমারি হ'য়েছে ? বাইরের দশজনের কথা শুনে শুনে আমি তার সম্বন্ধে একটা অন্যায় ধারণা করেছিলুম, এখন অমলের ব্যবহারে বা আচরণে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এ সব মিছে কথা। আর রূপে গুণে অর্থে ও মান সম্ভ্রমে আমাদের সমাজের কটা ছেলে তার যোগ্য ?"

অরুণা হাসিয়া কহিল,—"তাত শুন্‌ছি, কিন্তু তা বলে ত আর দিদি তাঁকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হচ্চে না। সে কখখনো হ'বে না, তাও তোমায় ঠিক্ বলে দিচ্ছি।"

বরদাবাবুর ইদানীং আর ঘুরা ফেরা ভাল লাগিতেছিল না,

বিশেষ কোন কালেই বেশী দিন কলিকাতা ছাড়িয়া না থাকায় কলিকাতার বাহিরে বেশী দিন থাকিলেই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। কয়েকমাস ওয়ালটেয়ারে কাটিয়া গিয়াছে, আবার যদি পুরীতেও অনেকটা দিন কাটিয়া যায়, তাহা হইলে যে তাঁহার নানান অসুবিধা। বরদা বাবুর ইচ্ছা ছিল যে যদি অরুণা অমত না করে তাহা হইলে তিনি অমলের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন, কিন্তু একবার লীলার ব্যবহারে ব্যথা পাইয়া এই কথাটা অরুণার নিকট হঠাৎ উত্থাপন করিতে একটু সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। অরুণার মনকে উপর্য্যুপরি তর্কের আঘাতে ব্যথিত করিয়া তুলিলে পাছে তাহার কৃতকার্য্যতায় বাধা ঘটে সেজন্য তিনি নানা অনাবশ্যক প্রসঙ্গের উত্থাপনে খানিকটা সময় অতিবাহিত করিয়া যথাসাধ্য কোমল স্বরে কহিলেন—"অরুণা, মা, আজ তোমায় একটা কথা বল্‌তে চাই।"

"কি কথা বাবা ?"

বরদাবাবু খানিকক্ষণ একটু নীরব থাকিয়া কহিলেন,—"দেখ অমলের প্রতি আমার বাস্তবিকই একটা স্নেহ জন্মেছে, আর সত্য সত্যই ছেলেটি ভাল।"

অরুণা বৃদ্ধের মনোগত ভাব যে না বুঝিয়াছিল তাহা নহে, তথাপি একটু কৌতূহলের সহিত হাস্য করিয়া কহিল,—"অমল বাবুর প্রশংসাত আজকাল বাবা তোমার কাছে দিন রাতই শুনতে পাই। এ কথাটা তেমন নূতন বলে মনে হচ্চে না।"

বরদাবাবু সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"তা ঠিক্, কিন্তু অরুণা, তোর বাবার স্বভাব ত জানিস্, জীবনে কোন দিন কোন অশান্তিকে, কোন অসত্যকে—যখন অযথার্থ বলে মনে করেছি তখন তাকে কোন মতেই গ্রহণ কর্‌তে পারি নাই।"

"সে কি আর আমাদের জানা নেই বাবা?

"সে আমি বেশ বুঝতে পারি অরুণা, তাই ত আজ সাহস করে তোকে একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছি।"

"বলনা, কি বল্‌বে?"

বৃদ্ধ এইবার ধীর গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "আমার ইচ্ছা, অমলের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করি।"

হাজার সপ্রতিভ হইলেও অরুণা মাথাটা একটু নীচু করিয়া লজ্জা বিজড়িত কণ্ঠে কহিল—"অমলবাবুর সহিত কি তুমি এ বিষয়ের আলোচনা করেছ?"

বরদাবাবু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—'কখ্খনো না, তোমার মত না জেনে আমি কি করে তাঁর কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করি? শেষটায় তুমিও যদি আমাকে লজ্জা দাও।"

অরুণা ক্লিষ্ট স্বরে কহিল—"যদি অমল বাবু এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তা সেও কি তোমার লজ্জার কারণ হবে না? তোমার অপমানের চেয়েও কি তোমার কুমারী-কন্যার সে অপমানটা বড় হ'বে না?"

বরদা বাবু কহিলেন—"সে কতকটা সত্য বটে, যদি তুমি অমলকে গ্রহণ কর্‌তে রাজি হও, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো, যতদিন

না অমল নিজে এসে তোমার পাণি প্রার্থনা কর্‌বে, ততদিন কোন রূপেই আমি এ বিষয়ে কোন কথা তুলবো না।"

অরুণা এইবার স্পষ্ট স্বরে মাথা উঁচু করিয়া কহিল—"যদি তাই হয় তাহ'লে আমিও তোমায় স্পষ্ট করে বল্‌ছি বাবা, আমি কোন কথা তুল্‌বো না, অমল বাবুর প্রতি আমার কোন অশ্রদ্ধার কারণ নেই।"

বরদা বাবু কন্যার শির চুম্বন করিয়া কহিলেন—'আশীর্ব্বাদ করি মা, তুমি সুখী হও, তোমাদের সুখে শান্তিতেই আমার সুখ শান্তি।"

পঁচিশ

কমলার আর সেই রাত্রিতে ঘুম হইল না, তাহার প্রাণে হঠাৎ একটী তীব্র দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল তাহার সারা দেহ ব্যাপিয়া প্রলয়ের অগ্নি জ্বলিতেছে। সুপ্ত নারী প্রকৃতি সুপ্ত সতীত্বের পবিত্রতার দীপ্ত বহ্নি আজ তাহার সারাচিত্তকে দহিয়া দহিয়া প্রধূমিত করিতে লাগিল। মন্মথ তুচ্ছ অপদার্থ হীন কাপুরুষ কোন্ সাহসে এমন করিয়া তাহার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হইল? মনে হইতেছিল—তাহার হাতখানা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। আর কেনই বা সে আপনার পবিত্রতা ভুলিয়া যাইয়া অমন করিয়া এক পিশাচের কবলে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল? বিবাহের সেই শুভ স্মরণীয় দিন হইতে একে একে নানা কথা মনে পড়িতে লাগিল। কি ভুলে সে এতদিন ভুলিয়াছিল? কি মোহে সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পিতার স্নেহে পিতার মানমর্য্যাদা, সম্পদ

গৌরব, অর্থ সম্পত্তি সে সকলের মোহ—কি স্বামীর প্রেমের তুলনায় বড় ? কই তাহার মত এমন আত্মগরিমাবিহীনা নারী ত তাহার পরিচিতদের মধ্যে কেহই নাই ? সকলেই স্বামীর গরবে গরবিণী, সকলেই স্বামীর সুখে দুঃখের জীবন সঙ্গিনী ? কিন্তু সে কোথায় ? কোথায়ও ত তাহার স্থান নাই। স্বামীর সহিত তাহার মাত্র দুইবার দেখা হইয়াছিল,—কত স্নেহে কত আদরেই না তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্বশুরের প্রাণভরা মা মা সম্বোধন, পল্লী যুবতীগণের প্রীতির সম্ভাষণ, গ্রাম্য প্রকৃতির শ্যাম শোভা, একে একে তাহার মানসপটে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে এমনি পাপীয়সী যে স্বামীর প্রেমপরিপূর্ণ পত্র দুইখানির উত্তরও পর্য্যন্ত সে দেয় নাই। যত দোষ, যত ত্রুটি—এতদিন যেগুলি তাহার চক্ষেও পড়ে নাই, যেগুলিকে সে গ্রাহ্যও করে নাই, আজ সে সকল মলিন পঙ্কিলতা তাহার কাছে স্তূপীকৃত হইয়া পীড়া দিতে আরম্ভ করিল। কিসের অভিমান ? কিসের অপমান ? কিছুই না। সে সব ভুলিবে, শুধু একবার যদি তাঁহাকে পায়।

আজ কমলা কোনরূপেই অশ্রুর বন্যা রোধ করিতে পারিতেছিল না। মন্মথের সহিত সে যেরূপ নির্লজ্জার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, যেরূপ প্রগলভতার পরিচয় দিয়াছে, সে সকল কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণ যেন লজ্জায় ও ঘৃণায় এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

নীচে খাবার টেবিলে শচীন, মন্মথ ও প্রীতিবালা সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বাহিরে তখন আর ঝড় বৃষ্টির উন্মাদনা

নাই। বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে ; কিন্তু জলো হাওয়া একটা শীতের তীব্রতা ব্যাস্ত করিয়া দিয়া বেগে ছুটিয়া যাইতেছিল। সমুদ্রের প্রবল উচ্ছ্বাস ভীষণ গর্জ্জন রব একইভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আকাশ ভাল করিয়া পরিষ্কার হয় নাই। এখানে সেখানে কালো জমাট মেঘ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

প্রীতিবালা একখানা গোলাপী রঙ্গের শাল গায় দিয়া শচীনের পাশের চেয়ার খানাতে বসিয়া শীতের প্রকোপের কথা বলিতেছিল। মন্মথ চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল—তাহার মুখের ভাবটা বড়ই বিষণ্ণ। ঝড়ের পরে গাছপালাগুলোর আকৃতি যেমন নীরস ও বিষণ্ণ দেখায় তাহার সাদা প্রফুল্ল মুখের ভিতরও তেমনি একটা উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শচীন্ কহিল."কমলা এখনও নীচে আস্‌ছে না কেন? কোন অসুখ করেনি ত?" এরূপ সময়ে বেয়ারা আসিয়া কহিল—"দিদিমণি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন, কোন সাড়া শব্দ পেলুম না?"

'সে কি?' বলিয়া প্রীতিবালা উপরে চলিয়া গেল। সে কমলার ঘরের পাশের একটা খোলা জানালার পথে দেখিতে পাইল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, আর কমলা বিছানার উপর ছট্‌ফট্ করিতেছে। প্রীতি কোনও অসুখের আশঙ্কা করিয়া ভীতস্বরে ডাকিল—"কমলা, লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার, কি হ'য়েছে?"

কমলা সে আহ্বানে চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া জড়িত স্বরে কহিল—"আমি আজ খাবনা বৌ'দি, আমার জন্যে আর দেরী করোনা, শরীরটা বড় ভাল নেই।" প্রীতি একথার

উপর আর কোনও ওজর আপত্তি না করিয়া স্নেহের কণ্ঠে কহিল—
"সে'কি? বেয়ারাকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাব?"

"না আজ আর কোন দরকার নেই, কাল ভোরে খবর দিলেই চল্‌বে এখন, তুমি যাও। ওঁরা সব বসে রয়েছেন।"

'আচ্ছা'—প্রীতিবালা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

মন্মথের যা কিছু কথা বার্ত্তা, আমোদ আহ্লাদ তা কমলকে কেন্দ্র করিয়াই ফুটিয়া বহিত হইত। এবেলা তাহার অনুপস্থিতিতে তেমন করিয়া খাওয়ার আসরটা আর জমিল না।

মন্মথও মনে মনে অনুতপ্ত হইয়াছিল; সে যে কত বড় একটা অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, নিমেষের ভুলে কত বড় অমর্য্যাদার, কত বড় হীনতার পরিচয় সে দিয়াছে, সেইকথা কমলা বলিয়া যাইবার পরই তাহার মনের ভিতর বার বার উপস্থিত হইয়া পীড়ন করিয়াছে। মানুষের মনের অবস্থা মুখদর্শনে প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধিমতী প্রীতিবালার মনে কি যেন অস্বাভাবিক আতঙ্কের ছায়া উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু সে তাহা হৃদয়ে স্থান দিল না। অন্যান্য দিন খাওয়া দাওয়ার পর প্রায়ই গান বাজনা হইত কিংবা খানিকটা গল্প চলিত; আজ আর কিছুই হইল না। শচীন্ ও প্রীতিবালা উপরে চলিয়া গেল। মন্মথ একটা সিগারেট ধরাইয়া বাহিরের বারান্দায় খানিকক্ষণ পাইচারী করিয়া শেষটা শুইবার ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুর গৃহে অতিথি সে—বন্ধুর স্ত্রী, ভগ্নী, পিতা সকলেই তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, আর সে কিনা, সেখানেই এমন একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিল, যাহা কোনরূপেই

তাহার যোগ্য নহে। কমলা বিবাহিতা—পরের স্ত্রী, তাহার প্রতি সে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, সে যে ভাবে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছে তাহা কোনও রূপে সমর্থন যোগ্য নহে। মন্মথ স্থির করিল, কাল যেরূপেই হউক সে পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে সে শুইয়া পড়িল।

ছাব্বিশ

পরদিন রাধাকান্ত বাবু উপরের খোলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমুদ্রের বুকে নবীন তপনের উদয়কালীন মধুর শোভা দেখিতেছেন, এরূপ সময় হঠাৎ মন্মথ আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আমি এক্ষুণি কল্‌কেতা চলে যাচ্ছি; মফঃস্বলের একজন উকীল একটা মাম্‌লা নিয়ে এসে আমার বাড়ীতে অপেক্ষা কচ্ছেন, জরুরি মোকদ্দমা, কালই পত্র পেয়েছি, তাই হঠাৎ চলে যেতে হল।" কমলা রাধাকান্ত বাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রতি মুখ ফিরাইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "মিসেস্ লাহিড়ী! শুন্‌লুম কাল আপনি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন, আজ ভাল বোধ কচ্চেন ত?"

কমলা আজ আর মন্মথের নমস্কার ফিরাইয়া দিল না। সে ধীর স্বরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ, অনেকটা ভাল। তা আপনি এমন হঠাৎ চলে যাবেন কাল ত তা শুনিনি।"

মন্মথ একটু থতমত খাইয়া কহিল "তা, তেমন প্রয়োজন হয়নি, তাই বলিনি।"

রাধাকান্তবাবু মন্মথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা এস বাবা, মনে থাকে যেন ছুটির সময় এই গরীবের বাড়ীর কথা ভুলোনা।

সে হাসিয়া কহিল: "তা বটে, আপনাদের এখানে এসে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, সে কি আর কথায় বলা চলে?"

"তোমার জিনিষপত্তর, সব ষ্টেসনে চলে গেছে ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আমি এখন আসি।" মন্মথ যাইবার সময় আর একবার মাথা তুলিয়া কমলার দিকে চাহিল, কিন্তু তাহাকে আর সেখানে দেখিতে পাইল না।

মন্মথকে ষ্টেসনে পঁহুছাইয়া দিয়া শচীন ফিরিয়া আসিলে রাধাকান্ত বাবু কহিলেন,—"বৌমা কোথায়?"

প্রীতিবালা পাশের ঘর হইতে ত্বরিত পদে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল—"কেন বাবা?"

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন,—"তোমাদের কাছে আমার কতকগুলো প্রয়োজনীয় কথা আছে, তোমরা একটু স্থির হ'য়ে বস।"

শচীন কহিল,—"কমলাকে কি ডেকে আনবো?"

রাধাকান্ত বাবু ঘাড় নাড়িয়া নিষেধ করিলেন, তারপর একটু বিছানার উপর চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে মৃদু স্বরে কহিলেন—"শচীন তুমি স্বপ্ন বিশ্বাস কর?"

শচীন উৎসুক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল—"কেন এ কথা জিজ্ঞেস কচ্চেন?"

প্রীতিবালা কহিল—"কেন বিশ্বাস করবো না, এমন অনেক

ব্যাপার আছে যা মানুষ কখনও কল্পনা কর্‌তে পারে না, অথচ তাওত ঘট্‌তে দেখা যায়, অথচ সে সব ব্যাপার আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়।"

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন,—"ইদানীং একটা বিষয় ভেবে ভেবে আমার মন বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছে। লজ্জায়, অভিমানে সে কথাটা তোমাদের বল্‌তে সাহস করিনি, অথচ অনেক দিন থেকেই বল্‌বো বল্‌বো মনে করেছি, আমার মনে হচ্চে, আর বেশী দিন আমি বাঁচ্‌বো না; তার আগে, সময় থাক্‌তে যদি এ বিষয়ে মন না দিই তা হ'লে বড় দুঃখে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হ'বে।"

"কোন্ কথা বাবা?" রাধাকান্ত বাবু অতি মৃদুস্বরে কহিলেন— "কমলের কথা; কমলার কষ্ট যে আর সহ্য কর্‌তে পারি না, যে অভিমানে, যে অর্থের দম্ভে আমি তার সমুদয় সুখশান্তি নষ্ট করেছি, গৃহিণীর কথা স্বাধীন তেজস্বী বিজয়কে নির্য্যাতন করেছি, এখন বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে সে জন্য আমি বড়ই অনুতপ্ত হ'য়ে পড়েছি। নইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভিশাপ, কন্যার মর্ম্মব্যথা, সব এক হয়ে আমায় পাগল করে তুল্‌ছে। বাপ হ'য়ে আমি সামান্য মান অভিমানের দম্ভে তাকে দুঃখের আগুণে পুড়িয়ে মারছি। কাল রাত্রিতে স্বপ্নে গৃহিণীকে দেখেছি, তিনি আমায় বড় শাসিয়ে গেছেন, কমল, কমল করে তিনি সেখানেও শান্তি পাচ্ছেন না।" রাধাকান্ত বাবুর দুই নয়ন বহিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল।

প্রীতিবালা কহিল—"বাবা, আপনার অভিপ্রায় পূর্ণ কর্‌তে আমরা

যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বো। কিন্তু বিজয় বাবু কোথায় আছেন তার ত কোন সংবাদই জানি না।"

রাধাকান্ত বাবু অত্যন্ত দুঃখের সহিত কহিলেন—"আমি রাগে জ্ঞানহারা হয়েছিলুম বলেত আর তোমরা সকলে তা হওনি। তোমাদেরও ত একটা কর্ত্তব্য ছিল।"

শচীন্ ধীর স্বরে কহিল—"সে সত্যি কথা, কিন্তু তখন যে আপনার আদেশকে অমান্য কর্‌বার কোন শক্তিই আমাদের ছিল না, এমন কি মায়ের আজ্ঞা পর্য্যন্ত আমি অবহেলা করেছি।"

প্রীতিবালা কহিল—"কেন তাঁর বাড়ীতে চিঠি লিখ্‌লেই ত এ বিষয়ের মীমাংসা হ'তে পারে।"

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন—"এ সোজা কথাটা আমার মাথায় এসেছিল, আমি পত্রও লিখেছিলুম,—কিন্তু কোন জবাব পাইনি, লোক পাঠিয়েছিলুম, গ্রামের কেউ বিজয়ের কোন সংবাদই জানে না।"

"তবে সমস্যার কথা বটে। "প্রীতিবালা একথা কহিয়া চুপ্ করিয়া রহিল।

"খোঁজ নেবার ভার আমি নিচ্ছি বাবা, বিজয় যদি বেঁচে থাকে তাহ'লে আমি ঠিক্ বের কর্‌তে পারবো, আপনি ব্যস্ত হবেন না। কোন দুশ্চিন্তা করে শরীর অসুস্থ করবেন না।"

"না—না—আমিত স্থিরই আছি। এ জীবনে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা সয়েছি কোনদিন কিছুতেই মুষড়ে পড়িনি, যতদিন বেঁচে থাকি, সব সহ্য কর্‌বো, কিন্তু কোন রকমেই আমার কর্ত্তব্যের অবহেলা হয় সেটা আমি চাইনে, শুধু সেইটে তোমরা দেখ।"

"কমলা কি বিজয়ের কোন সংবাদই জানে না?" প্রীতিবালার এই কথায় রাধাকান্ত বাবু কহিলেন "আমার ত সে কথা মনে হয় না, তুমি বরং জিজ্ঞেস কর।"

*　　*　　*　　*

বিজয় ও তাহার বাবা কমলার নিকট যে কয়েকখানি চিঠি লিখিয়াছিল তাহার একখানাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সারা রাত্রি সে তন্ন তন্ন করিয়া ট্রাঙ্ক ও পেটারার জিনিসপত্র উলটাইয়া সে কয়েকখানা ক্ষুদ্র চিঠির খোঁজ করিয়াছে। এক সময়ে যাহা তুচ্ছ ও নগণ্য ছিল আজ তাহাই কি না জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে তাহার নিকট গণ্য হইল। বিবাহের পর বিজয়ও কমলার একখানা ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল, অযত্নে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, একটা সামান্য ছায়ার মত যে চিহ্ন আছে উহা হইতে কোনরূপেই মানুষটিকে চিনিবার জো নাই। এইরূপে এক দিনকার যে সকল জিনিষকে সে হেলার চক্ষে দেখিয়াছে সে সকলকে মাথার মণি করিয়া তুলিতে চাহিয়াও আর তাহা পারিল না।

মন্মথের ব্যবহারে তাহার সমুদয় নারীগর্ব্ব একেবারে অপমানের ঘনঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। কমলার মনে হইতেছিল,—তাহার ন্যায় অপরাধিনী, নারীর গর্ব্বহারিণী রমণী আর পৃথিবীতে কেহই নাই। যদিও এ বাড়ীর কেহই এ ঘটনার বিন্দুমাত্রও কিছু জানিতেন না, কিন্তু কমলার বিশ্বাস হইয়াছিল, ইহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। আকাশে বাতাসে পৃথিবীর সর্ব্বত্র একথাটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সাতাশ

অরুণা পিতার নিকট হইতে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিল। সে বুঝিল এখন অমলকে হাত করিতে হইলে তাহার নিজের আত্মশক্তি প্রয়োগ করা উচিত। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সকল বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকলিত স্বেচ্ছায় সরিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা আসিবার পরে কয়েকদিন অমলের সহিত তাহার বড় একটা দেখা হয় নাই। নূতন বাড়ী ঘরে আবার নূতনরূপে সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। আর বরদাবাবুও কয়েক মাস পরে কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন বন্ধুদিগকে নিজের আগমন বার্ত্তা শুনাইয়া সাধের গৃহনীড়টিকে নূতন করিয়া নিজের সুখ শান্তির অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত ছিলেন। এইরূপ নানা ঝঞ্ঝাট ও কাজের ভাড় চুকিয়া গেলে—আবার পূর্ব্বের মত তাঁহার দিনগুলি দিব্য অলস আরামে কাটিয়া যাইতে সুরু হইল।

পৌষ মাসের ছোট বেলা প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। রৌদ্র অনেকক্ষণ হয় সরিয়া গিয়া শীতের প্রভাবে বিস্তার করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। বরদাবাবু সেদিনের দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভটা বেশ মনোযোগ দিয়া পড়িতেছেন। এরূপ সময়ে গলির মোড়ে অমলের মোটর আসিয়া পড়িল। অমল ধীরে ধীরে খোলা দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, বরদাবাবু একা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। অমলের জুতার শব্দ পাইয়া বরদাবাবু ঘরের কাগজখানা হাতের টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া হাস্যমুখে

কহিলেন—"এইযে অমল, এস বাবা, এস। কয়েকদিন তোমায় দেখতে পাইনি কেন?" অমল কহিল- "এসেই নানা হ্যাঙ্গামে জড়িয়ে পড়েছিলুম, তারপর সব গুছিয়ে গাছিয়ে দেখে শুনে নিতেও সময় কেটে গেল; তা আপনি পুরী যাচ্ছেন কবে?"

"না, আজকাল আর কল্‌কাতা ছেড়ে নড়্‌ছিনি। লীলাকে লিখে দিয়েছি যে গ্রীষ্মের সময় ছাড়া আমার নড়া চড়া হ'বে না।"

"আজ্ঞে তা ঠিক্।" অমল একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া সবেমাত্র এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছে, ঠিক্ তেমনি সময়ে অরুণা কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিল, তাহার গৌরবর্ণ মুখের উপর সন্ধ্যার শেষ সুবর্ণ রশ্মি-রেখা খোলা জানালার পথে আসিয়া পড়ায় অমলের চক্ষে তাহাকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের চিত্র খুলিয়া দিল। অমল তাড়াতাড়ি তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিল—"আপনার অপেক্ষায়ই যে বসে রয়েছি।" অরুণা লীলাভঙ্গিতে ঘাড় বাকাইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—"এত সৌভাগ্য আমার? কেন বলুনত? তাই বুঝি এতদিন দেখাটিও দেন নাই।" অরুণাকে আর কোনও কথা বলিতে না দিয়া বরদাবাবু কহিলেন—"যাও মা, তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে এস, অমলের বোধ হয় চা খাওয়াই হয় নি।" অরুণা তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল। অমল কহিল—"আজ বায়স্কোপে অনেক দিন পরে 'লা মিজারেবল্‌'এর ফিলম্‌টা দিয়েছে, আপনাকে ও মিস্ রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাব বলে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।"

বরদাবাবু হাসিয়া তৃপ্তির সহিত কহিলেন—"তোমার আবার এ পাগ্‌লামো কেন অমল?"

"আজ্ঞে, মানুষ দিনরাত কাজ কাজ করে মেতে থাকবে আর সুবোধ সুশীল বালক হবে। তা কি হয়? একটু আনন্দ চাই বই কি।"

বরদাবাবু বলিলেন—"অমল, তোমার এই কথার ভিতর বাস্তবিক অনেকগুলি ভাববার বিষয় আছে। ঈশ্বর আনন্দময়—জগত আনন্দময়, আকাশে আনন্দ, ফুলের হাসিতে আনন্দ, শিশুর প্রাণভরা সরলহাসিতে আনন্দ, সর্ব্বত্রই আনন্দের ছড়াছড়ি; এই আনন্দকে যদি আমরা অন্তরে বাহিরে অনুভব করতে না পারি তা হ'লে জীবনের অনেকটাই বৃথা হ'য়ে যায়।" এমন সময়ে অরুণা বেয়ারার সাহায্যে চায়ের সরঞ্জাম এবং জলখাবারের জিনিষপত্র সহ আসিয়া নীচে উপস্থিত হইল। বরদা বাবু চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন—"অরুণা, তুমি চা খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈয়েরি হ'য়ে এস, অমল আজ বায়স্কোপে না নিয়ে ছাড়ছেনা, অনেকক্ষণ ধরে সেজন্য বসে রয়েছে।"

অরুণা অমলকে প্রীতি ও আদরের সহিত চা ও জলখাবার দিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"কেন মিছামিছি অমল বাবু আবার লোভ বাড়িয়ে তুলছেন, জানেনত বায়স্কোপের নেশা আজকাল বড় সহজ নেশা নয়, যাকে একবার চেপে বসে তাকে বড় একটা সহজে ছাড়ে না।" এই বলিয়া অরুণা ও বরদা বাবু প্রস্তুত হইবার জন্য উপরে উঠিয়া গেলেন!

সেদিন বায়স্কোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরদাবাবু প্রসন্ন মুখে অরুণাকে কহিল "কেমন মা, অমলের মত এমন ছেলে কয়টী আমাদের সমাজে আছে বলত?"

অরুণা ঈষৎ হাসিয়া মাথা নত করিয়া কহিল—"বাবা, কাঁচও কাঞ্চনের সংসর্গে সোণার মত দেখায়। কিন্তু সোণার সংসর্গ হইতে দূরে সরাইয়া লইলে তাহার কি তেমন সৌন্দর্য্য থাকে ?"

বরদা বাবু হাসিয়া কহিলেন—"এই অমলের উপর আমার যে কত বড় ঘৃণা ছিল সেত জানিস্, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি বড় ছেলেরা উৎছন্ন যায় তার মূলে সমাজের সংকীর্ণতা।"

অরুণা কহিল—"এই যে অমল বাবুর ভিতর পরিবর্ত্তন এসেছে, সে বাবা তোমার চরিত্রের প্রভাবে হয়েছে।"

আটাশ

বাকিপুরের ও জব্বলপুরের দুইজন মাড়োয়ারি বণিকের মধ্যে একটা বড় রকমের মোকদ্দমা চলিতেছিল। উভয় পক্ষই অর্থশালী এবং পরস্পর পরস্পরকে জব্দ করিবার জন্য পণ করিয়া অর্থ ব্যয় করিতে সুরু করিয়াছিল। ব্রজবাবু ও বিজয় এক পক্ষের মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেছিলেন, কিন্তু অপর পক্ষ বাঁকিপুর ও কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার আনায় এ পক্ষও পশ্চাৎপদ হইল না। একদিন বিকেল বেলা কাছারীর শেষে ব্রজবাবু বিজয়ের ওখানে ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া কহিলেন—"তাইত হে বিজয়, বড় মুস্কিলে পড়লুম।" বিজয় সে সময়ে তাহার বাগানের ফুল গাছের চারাগুলির তদ্বির করিতেছিল, ব্রজবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"কিসের মুস্কিল ব্রজবাবু? ওরে বেয়ারা তামাক নিয়ে আয়।"

উভয়ে বসিবার ঘরে যাইয়া স্থিরভাবে বসিলে পর ব্রজবাবু কহিলেন "দেখত বাবা কি মুস্কিল। সেই তোমাকে কিছুদিন আগে একটা বাড়ী দেখে রাখতে বলেছিলুম, মনে আছে ত? এই দেখনা আজ তাঁরা সব এখানে আস্‌ছেন। মিঃ এস্, সি, চৌধুরী, যিনি বাঁকিপুরের ব্যারিষ্টার, তিনি সপরিবারে আস্‌ছেন কি না, তাইত গোলযোগ, চৌধুরী সাহেবের বাপই হচ্চেন আমাদের সেই পুরীর বন্ধুর পরিচিত ভদ্রলোক। মোকদ্দমা ত আর তিন চার মাসের আগে শেষ হচ্চে না, তাই সব্বাই দলে দলে আস্‌ছেন। সঙ্গে পরিবার।"

বিজয় হাসিয়া কহিল—"সে আর কি মুস্কিল, বলুনত?"

"মুস্কিল নয় বল কি হে, দেখ একজন সাহেবকে যত না ডরাই, একজন বিলাত ফেরতকে তত বেশী ভয় পাই, আবার সঙ্গে স্ত্রীলোক। তুমি ত জাননা, মিঃ চৌধুরীরা খুব বড় লোক হে, দেশেও মস্ত বড় জমিদারী। কাজেই এদের উপযুক্তরূপ অভ্যর্থনা করা, ব্যাপারটা সহজ নয়।"

"সে জন্যে ভাব্‌বেন না, সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে।"

ব্রজবাবু একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন—"ডাক বাঙ্গলোতে ত এসে থাক্‌বে গণপত লালের ব্যারিষ্টার সাহেব। এখন এদের কি ব্যবস্থা করি, ভাল বাড়ীইবা কোথায়?" ব্রজবাবুর স্বভাব এই ছিল যে তিনি নিজে এ সকল কাজকর্ম্ম আদর অভ্যর্থনা করিতে বড় নিপুণ ছিলেন না, পয়সা খরচ করিতেও তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না! কিন্তু সব দিক্ দেখিয়া শুনিয়া লইতে হইলেই তাঁহার গোল বাঁধিয়া যাইত।

বিজয় কহিল—"আমার এ বাড়ীটাই বরং মিঃ চৌধুরীকে ছেড়ে দোব। এ বাড়ীটাতে হবে ত?"

ব্রজবাবু স্বোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "বেশ হ'বে, সে কটা দিন বুঝলে, বিজয় তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাকবে এক্ষুণি গিয়ে গিন্নিকে বলছি।"

এই বৃদ্ধ মহানুভব ব্যক্তি বিজয়কে অল্পদিনের পরিচয়েই পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। বিজয়ের কথায় নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন—"তা হ'লে তুমিই সব কর বাবা! আমার মাথার বোঝা নেমে গেল, আর দেরী করবো না। বুঝলেত শেষ রাত্তিরের ট্রেণে এসে পঁহুছাবে: আমি যাই, দুটো বেয়ারা পাঠিয়ে দিই গে। আমি বুড়ো মানুষ আর ষ্টেসনে যাচ্ছিনে, যদি তুমি পার, যেও, কি বল। নইলে ওরাই যাবে।"

বিজয় কহিল—"সেটা কোন মতেই ভাল হয় না, হাজার হউক তাঁরা বাঙ্গালী, এই দূরদেশে আসছেন, আমাদের একজনের যাওয়া অবশ্য উচিত, সে আমিই যাব।"

"বেশ! বেশ! আচ্ছা তবে আমি চল্লুম।" ব্রজবাবু হাতের লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

এদিকের ঘটনাটা বলিয়া লই। শচীন বাঁকিপুরে যাইয়াই এইবার সম্পূর্ণ আশাতীতরূপে জব্বলপুরের এই মামলাটার ভার লইল। এতদিন সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এইরূপ কোন বড় মোকদ্দমা পরিচালনা করে নাই। মোকদ্দমার কাগজপত্রগুলি পড়িবার জন্য কিছুদিন সময় লইয়া সে পুরীতে এ কথা লিখিয়া পাঠাইলে রাধাকান্ত

বাবু তাহাকে জানাইলেন যে এ সুযোগে তিনি একবার ভারতবর্ষের নানাস্থান, বিশেষতঃ মধ্যপ্রদেশ বেড়াইবার সুযোগ ছাড়িবেন না। শচীনের কোনও ওজর আপত্তি থাকিল না, কাজেই জব্বলপুরে এক-খানা ভাল বাড়ী ঠিক্ করিবার জন্য মক্কেলের উপর আদেশ করিতে হইল। মক্কেল যথাসময়ে উকীল ব্রজবাবুকে টেলীগ্রাম করিয়া দিলেন। পুরী হইয়া শচীন যথাসময়ে সপরিবারে জব্বলপুর রওনা হইল।

ভোরে বিজয় সর্ব্বাঙ্গ ওভার কোটে ঢাকিয়া ও মাথায় পাগড়ী জড়াইয়া তিনজন চাকর সঙ্গে লইয়া ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিল, গাড়ী পৌঁছিবার বড় বিশেষ বাকী নাই। সে ওয়েটিংরুমে বসিয়া এইরূপ নানা কথার তোলপাড় করিতেছে, ঠিক মুহূর্ত্তে হুস্ হুস্ শব্দে গাড়ী আসিয়া প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতে করিতে একখানা রিজার্ভ গাড়ীর সন্নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইল তাহাদের তথায় পঁহুছিতে যে সময়টুকু লাগিয়াছে, তন্মধ্যেই গাড়ীর সন্নিকটে প্রচুর লটবহর জমিয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টার সাহেবের চাকরেরা সব জিনিষপত্রের তত্ত্বাবধান করিতেছে। বিজয় দেখিতে পাইল যে প্লাটফর্ম্মে একটী সুদর্শন যুবক সাহেবী পোষাকে দাঁড়াইয়া আছেন, গাড়ীর ভিতরে একটী বৃদ্ধ ও দুইটী সুন্দরী তরুণী নব্য ফ্যাসানের সুদৃশ্য বস্ত্রাবরণে দেহ আবৃত করিয়া অবতরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

বিজয় তাড়াতাড়ি যুবকটির নিকটস্থ হইয়া কহিলেন—"আমার এসে পৌঁছাতে একটু বিলম্ব হয়েছে, আপনাদের বড়ই অসুবিধা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আপনি ত মিঃ চৌধুরী।"

মিঃ চৌধুরী হাসিয়া কহিলেন—"আজ্ঞে, হাঁ, আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্চেন, আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। 'বাসা কতদূর হবে?'

"এখান থেকে এক মাইলের বেশী হ'বে না। বাইরে মোটর অপেক্ষা কচ্ছে। ওরে মালগুলো সব গাড়ীতে নিয়ে যা। দেখুন এই শীতের ভেতর ব্রজ বাবু আসতে পাল্লেন না, বুড়ো মানুষ, সেজন্য তিনি লজ্জিত।"

মিঃ চৌধুরী ইতি মধ্যে একে একে মেয়েদের ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে পরম যত্নের সহিত সন্তর্পণে নামাইয়া লইয়া ষ্টেসনের বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিক্ তখন ফরসা হইয়া আসিয়াছিল—বিজয় ইঁহাদের সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া অপর একখানা গাড়ীতে আরোহণ করিয়া পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রসর হইল।

সহরের একপাশে খোলা মাঠের মাঝখানে বিজয়ের বাড়ীখানি ছবির মত দেখাইতেছিল। সকলে গাড়ী হইতে নামিলে বিজয় তাহাদিগকে বাড়ীর সমুদয় খুঁটিনাটি সুবিধা অসুবিধা বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

প্রীতিবালা আনন্দের সহিত কহিল—"দিব্য বাড়ীটিত!" বিজয় আনন্দের ও গর্ব্বের সহিত কহিল—"এখানে আপনাদের যোগ্য বাড়ী কি করে পাব বলুন?" ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিজয় ব্রজ বাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

*   *   *   *

আটটা বাজিয়া গিয়াছে। শচীন্ ও রাধাকান্তবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া নানা কথা কহিতেছেন। বাইরে সূর্য্যের আলো দিব্য

কিরণচ্ছটা ছড়াইয়া দিয়াছে। এরূপ সময় ব্রজ বাবু বিজয়কে সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয় ব্রজ বাবুর পরিচয় দেওয়া মাত্র শচীন্দ্র খুব জোরে করমর্দ্দন করিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া রাধাকান্ত বাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। রাধাকান্ত বাবু বিশেষ আগ্রহের সহিত ব্রজ বাবুকে নমস্কার ও আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন "আপনি স্বনামধন্য পুরুষ ব্রজ বাবু, আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম ; আমার বন্ধু ও আত্মীয় নরেন্দ্র বাবু আপনাকে আমার জন্যে কিছু কষ্ট করবার জন্য একখানা চিঠিও লিখেছিলেন, সে মাস কয়েক আগের কথা। আজ আপনাকে দেখে বড়ই আনন্দ লাভ করলুম্।"

ব্রজ বাবু তাহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্য সহকারে কহিলেন—"বিলক্ষণ! আমরা এই দূরদেশে পড়ে আছি, দেশের লোক মেলে কোথায় ? আপনার পায়ের ধূলো দিয়ে যে আমাদের বাড়ী পবিত্র করলেন।'

রাধাকান্ত বাবু লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"সে কি কথা ?"

শচীন বিজয়কে দেখাইয়া কহিল—"ব্রজবাবু ওঁর পরিচয় ত দিলেন না ?"

ব্রজবাবু বিজয়ের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন "এ হচ্চে আমাদের জব্বলপুরের Life and soul, এ ছোকরার মত ভাল ছেলে আর আর আমি কথখনো দেখিনি। এঁর নাম হচ্ছে বিজয়লাল লাহিড়ী আজ পাঁচ বছরের উপর হলো এখানে প্র্যাকটিক্ সুরু করেছেন, এরি মধ্যে পশার জমিয়ে ফেলেছে, আপনাদের যোগ্য ভাল বাড়ী

পেলুম না, বিজয় তার বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, এ বাড়ীটি ওর ; এমন চমৎকার স্বভাব—

বিজয় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি বাজে বকচেন্ ব্রজ বাবু ?"

কিন্তু ব্রজ বাবু বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন—"কি বলব মিঃ চৌধুরী, আমাদের ক্লাব ও লাইব্রেরী দেখলে অবাক্ হবেন, সব ওর চেষ্টা যত্নে হয়েছে।" বিজয়ের প্রতি স্নেহপূর্ণ হাস্য কৌতুক মিশ্রিত ভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন "ওহে বিজয়, ক্লাবের জন্যে চাঁদা আদায় কর্‌তে ভুল না যেন।"

মিঃ চৌধুরী কহিলেন—'বেশত আজ সন্ধ্যের পর আপনাদের ক্লাবে নিয়ে যাবেন বিজয় বাবু ; ভুলবেন না যেন।"

বিজয় কহিল—"নিশ্চয়, বিকেলে আপনাদের নিয়ে যাব বই কি ?"

রাধাকান্ত বাবু একটু চিন্তিতভাবে বিজয়ের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহার কি যেন মনে পড়িতেছিল—যেন এই যুবকটীকে কোথায় দেখিয়াছেন, ঠিক্ ঠাহর করিতে পারিতেছিলেন না। ব্রজ বাবুকে কহিলেন—"আমরা বিজয় বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, তা ওঁর নিজের বাড়ী ছেড়ে কি অসুবিধে হ'বে না। আমাদের ত যে রকম দেখছি, অন্ততঃ শচীর মোকদ্দমার ভ্যাজাল যে দু'মাসের ভিতর মিটবে তাত মনে হয় না। এত বেশী দিন অন্য যারগায় থাক্‌তেও ওঁরত বেজায় অসুবিধে হবে।"

ব্রজ বাবু হাসিয়া কহিলেন—"সন্ন্যেসীর আবার অসুবিধে কি মশাই ?"

"সে কি রকম ?"

'তা বুঝি জানেন না ?'

বিজয় এইবার অসহিষ্ণু হইয়া কহিল—'কি বাজে বক্‌ছেন, ওঁদের বিশ্রাম করতে দিন, আবার মোকদ্দমার সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে, এইবার উঠুন না।"

ব্রজ বাবু মনভোলা মানুষ, কোন বিষয়ে ঘোর প্যাঁচ জানিতেন না, আর বিজয়ের প্রতি তাঁহার এমন একটা স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল যে তাহার বিষয়ে কোন কথা উঠিলে আর সে সকল এক নিমেষে শেষ করিতে পারিতেন না। তিনি বিজয়ের কোন কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন—'সন্ন্যেসী নয় ত কি, বাপ মা ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র কেউ নেই মশাই, শুধু পরের জন্য টাকা রোজগার কচ্চে, কত গরিব দুঃখী যে ওর কাছে সাহায্য পায় সে সীমা সংখ্যা নেই। বিজয় সংসারে বই ছাড়া আর কোন জিনিষকে ভালবাসিতে শিখে নাই। আপনারা যতদিন এখানে থাক্‌বেন্ সে কটা দিন ও আমার ওখানে থাক্‌বে।"

শচীনের মনের ভিতর দিয়া একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। সে বিজয়ের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া পরম আদরের সহিত হ্যাণ্ডশেক করিয়া কহিল—"আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি—আমাদের দেশে এমন সন্ন্যাসীর খুব দরকার আছে।" আর কোন কথা হইল না, ব্রজবাবু ও বিজয় নবাগত অতিথিদিগকে বিশ্রামের অবসর দিয়া চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ

প্রীতিবালা ও কমলা স্নান সারিয়া উপরের ঘরের এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া নূতন যায়গায় নূতন দর্শনের তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। প্রীতিবালা কহিল—"এ বাড়ীর মালিকটীর বেশ রুচি আছে দেখতে পাচ্ছি। দেখেছ কমল, কেমন সুন্দর ছোট্ট ফুলের বাগানটি, স্থানটি কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।" দূরে নীল পর্ব্বত শ্রেণীর শ্যাম শোভার দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে কমলা কহিল—'বৌ দিদি, পাহাড় আর সমুদ্র বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, হ্যাঁ ভাই নর্ম্মদার জল প্রপাত কবে দেখবে?"

"সে হবে গো হ'বে"—প্রীতির মুখে একটা গানের সুর ঝঙ্কার দিয়া যাইতেছিল। এরূপ সময়ে শচীন সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শচীন কহিল—'যায়গাটি অতি চমৎকার, কি বলিস্ কমল?'

"হ্যাঁ দাদা।"

"কিন্তু এটি সন্নেসীর কুটীর।" প্রীতিবালা স্বামীর কথায় হাসিয়া উত্তর করিল—'তা হলে নিশ্চয়ই সে নবীন সন্ন্যেসী?'

'কেন?

এই দেখনা আলমারীতে up to date ইংরেজী ও বাঙ্গালা নবেলের অবধি নেই। তা ছাড়া মাসিক কাগজ, কবিতার খাতা কোন জিনিষেরই অভাব আছে বলে ত মনে হয় না।'

'এত অল্প সময়ে এত কথা কি করে আবিষ্কার করলে।'

কমল কহিল—'তা বুঝি জাননা দাদা, এ ঘরের মালিকটি খুব

গোছানো লোক যে সে কথা নিশ্চিত, খাতাপত্র কাগজ কলম গুলি কিছুই সে গুছিয়ে রেখে যেতে পারেনি, কাজেই বউদিদির প্রচুর খোরাক জুটে গেছে।'

শচীন কহিল—'এ ভাল নয় প্রীতি, বেচারা নিজে ব্রজবাবুর বাড়ীতে থেকে আমাদের জন্য নিজের বাড়ী লোকজন জিনিষ পত্র সব ছেড়ে দিয়েছেন।" প্রীতি হাসিয়া কহিল "খুব Sacrifice বটে। তা একদিন আমরা গান শুনিয়ে, খাবার নিমন্ত্রণ করে কৃতজ্ঞতা জানাব।"

"তাত করবে, সেজন্যে একজন লোকের খাতাপত্র নাড়া-চাড়বার অধিকারত আর তোমরা পাওনি, এ যে অন্যায় কথা।"

"চুপ কর, এখানে আর কারুপক্ষ নিয়ে ব্যারিষ্টারি করতে হবে না।"

শচীন হাসিয়া কহিল—"বেশ। শেষটায় চোর ধরা না পড়লেই হয়।"

রাধাকান্ত বাবু ধীরে ধীরে সে ঘরে ঢুকিয়া উন্মত্তের মত সে একখানা সোফায় বসিয়া পড়িলেন,—শচীন্ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল "কি বাবা কোন অসুখ করেছে কি?"

রাধাকান্ত বাবু ঘাড় নাড়িলেন। কমলা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল—"তবে এ রকম হাপাচ্চ কেন বাবা?"

তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন—"মা কমল, বেহারাকে একগ্লাস জল নিয়ে আসতে বলত।" কমলা চলিয়া গেলে কহিলেন "বৌমা! শচীন, এই বিজয় ত আমাদের বিজয় নয়!"

"একথা হঠাৎ আপনার মনে হ'ল কেন বাবা!"

"আমার শুধু সন্দেহ নয়, স্থির বলে মনে হচ্চে।"

শচীন কহিল—"অসম্ভব! কি করে হবে বলুন ত? ব্রজবাবু এ বিজয় বাবুর যে পরিচয় দিলেন তাতে নামের মিল ছাড়া আর ত কিছু মিল্‌ছে না। আর তার পক্ষে এই দূরদেশে এসে এত অল্প সময়ের মধ্যে পসার জমিয়ে এত বড় বাড়ী ঘর করা কখনো সম্ভব পর নয়।"

রামকান্তবাবু ধীর স্বরে কহিলেন—"কেন নয় বাবা? সে ত লেখাপড়ায় কৃতীই ছিল, তারপর যার সাহস, আত্মনির্ভর ও তেজস্বিতা আছে সে রকম লোকের পক্ষে সংসারে বড় হওয়া খুব কঠিন কথা নয়।"

"নামের সাদৃশ্য দেখে আমারও প্রথম যেন কেমন একটু খট্‌কা লেগেছিল, কিন্তু শেষটায় দেখ্‌লুম, আমার বিজয়ের যে চেহারা আবছায়ার মত মনে আছে তার সঙ্গে এর চেহারার বড় একটা মিল হচ্চে না। আচ্ছা যখন এখানে এসেছি—ক্রমে এই ব্রজবাবুর সাহায্যে সব কথাই জানা যাইবে। এখন ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।"

এতক্ষণ প্রীতিবালা কোন কথা কহে নাই, সে একবার মনে মনে ভাবিল আরও এইবার অধিকারীর ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজ পত্রাদি নাড়িয়া চাড়িয়া ঐ রকমই কেমন একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। তবে সে আজত একদিন মাত্র এখানে এসে কোন কথা বল্‌তে সাহস পাচ্ছিল না! তারপর একজন লোকের পরিচয় না জেনে পট করে তার কাঁধে কোন রকমেই কমলকে চাপাইয়া দিতে রাজি নহে।

এরূপ সময়ে কিছু জল খাবার লইয়া বেহারার সহিত কমল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল আর তাহাদের মধ্যে সে প্রসঙ্গ হইল না।

বৈকেল বেলা ব্রজবাবু বিজয়কে লইয়া মোটরে আসিয়া রাধাকান্তবাবু ও শচীনকে ক্লাবে লইয়া গেলেন। সহরের সমুদয় বাঙ্গালী বাবুরই সে দিন নবাগত সম্ভ্রান্ত অতিথিদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য মিলিত হইয়াছিলেন।

রাধাকান্তবাবু ও শচীন ক্লাবের ব্যবস্থা, নিয়মাবলী, প্রত্যেক বিষয়ের সুনিয়ম, লাইব্রেরী বিভাগের প্রচুর পুস্তক সংখ্যা, খেলিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদের নিকট চাঁদার খাতা উপস্থিত করিবামাত্র রাধাকান্তবাবু নিজে দুই হাজার টাকা সহি করিয়া দিলেন, শচীন্দ্রও হাজার টাকা সহি করিল। এই সময়ে বিজয় কহিল—'আপনারাও এখানকার স্থায়ী অধিবাসী নন, শুধু বেড়াতে এসেছেন মাত্র, যদি দয়া করে আপনাদের স্থায়ী ঠিকানাটা লিখে দেন তাহলে আমাদের পক্ষে মাঝে মাঝে পত্র ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।'

রাধাকান্তবাবু সাগ্রহে কহিলেন "বেশ কথা বিজয়বাবু আপনারা আমাকে আপনাদের একজন হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক বলে গ্রহণ করলে চরিতার্থ হব। এইরূপ শিষ্টাচারের পর তাহার নামের পাশে লিখিলেন 'জমিদার শ্যামনগর।'

বিজয়ের চক্ষের সম্মুখ হইতে হঠাৎ যেন আলোগুলি নিবিয়া গেল। সে ত্বরিতপদে খাতাখানা যথাস্থানে রাখিয়া ক্লাব ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এমনি তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল যে,

কাহারও আর কোন কথা বলিবার সুযোগ হইল না। তাহার এইরূপ ব্যবহারটা অন্য সকলের পক্ষে তেমন আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইল রাধাকান্ত বাবু ও শচীনের মনে একটা সন্দেহের কালো ছায়া ঢালিয়া যে দিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ব্রজবাবু বলিলেন—"আমাদের ক্লাবটী কেমন দেখ্‌লেন?" "উভয়ে মিলিত কণ্ঠে কহিলেন,—"চমৎকার।" ক্রমে যাইবার সময় উপস্থিত হইল ব্রজবাবু বিজয়কে কোথাও না দেখিতে পাইয়া কহিলে "তাইত বিজয় কোথায়?"

ক্লাবের দ্বারোয়ান কহিল—"হুজুর বাবুত এই থোড়া ঘড়ি হুয়া ঘর চলা গিয়া।"

ব্রজবাবু অন্যমনস্কভাবে কহিলেন—"তাইত আমি যে জানতেই পারলুম না, আচ্ছা।" অতিথিদ্বয়কে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ী যাইয়া বিজয়ের সন্ধান লইয়া জানিলেন সে তখনও ফিরিয়া আসে নাই।

ত্রিশ

"আমার প্রতিজ্ঞা যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, অক্ষরে অক্ষরে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিব। কিসের, কয়দিনেরই বা এ জীবন! দরিদ্রের আবার বিয়ে কেন? আর করিলেই বা তাহা বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের জন্য উৎসুক কেন? কমলার নিকট আমি বিবাহের পর হইতেইত উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছি। তবুত একটা কর্ত্তব্য ছিল আমি মনে প্রাণে সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি; ধর্ম্মের নিকটত

অপরাধী নই। বাবার মৃত্যু সময়ের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিতেছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন এই দৃঢ়তা চিরদিন আমার সহায় থাকে।"

কোথায় যাইব জানিনা, তবে বাঙ্গলা দেশে যে থাকিব না তাহা নিশ্চিত। তাহা হইলে হয়ত একদিন ঐ পরিবারের কাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে। যাক্ একটা জীবন ব্যর্থ হইলেই বা কি ক্ষতি। ২২শে জুলাই ১০১০।"

"দেশ ছাড়িতে হইল—"কি করিব নিরুপায়। দেশের সকলেই ত আমাকে নিন্দা করিতেছে। অথচ আমি জানি আমার কোন দোষ নাই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এইখানে এই আমগাছের তলায় বাবার মৃতদেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

পিসীমা কাশী যাইবেন ভাল কথা, তাহাকে এই শূন্যপুরীতে কি করিয়াই বা থাকিতে বলি। তাঁহার ইচ্ছা, আবার বিবাহ করি,—কি সুন্দর ব্যবস্থা। একবারের ক্ষত জুড়ায় নাই, আবার সাধ করিয়া ক্ষত করিব। বেশ। ১০ই আগষ্ট—১৯১০

"আজ কি ভাবে কেমন করিয়া যে এই রমণীকে রক্ষা করিলাম সে কথা বলিয়া বুঝাইতে পারি না ; যে জীবন উপেক্ষিত, সে জীবনই কিনা অপরের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। কমলা এখন কেমন হইয়াছে, সে কথা আমার মনে করিয়া আর লাভ কি ! যে প্রতিমা এ জীবনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছি, তাহার কথা আর কেনই বা স্মরণ করি ! তবু ভুল—তবু একটা মোহ।'

* * * * * *

কি দেখিলাম, এমন রূপত কোথাও দেখি নাই।

লীলা—নামটিও কি সুন্দর, আর কি সুন্দর ব্যবহার। আর কমলা—ছিঃ লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। লীলার সঙ্গে কথা কহিলে—মনে হয় যেন এ জীবন ধন্য হইল। কেন এরূপ হইল। না-না এখানে আর থাকা হইবে না। এত প্রশংসা, এত আদর সে যে অসহ্য সকলেই যে পরিচয়ের জন্য ব্যস্ত। সে হইতে পারে না! পালাইতে হইবে। কোথায়? হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ঘুরিব, নিশ্চয় স্থান মিলিবে। সংসারে যে একা—তাহার আপনার জন কেহ না থাকিকেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই তাহার আপনার। আজই পলাইব।"

প্রীতিবালা—বিজয়ের শুইবার ঘরের একটা দেরাজ নিজেদের সাংসারিক ব্যবহারোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে উহা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিতে যাইয়া একখানা ছোটো রকমের বাঁধান খাতা পাইল। খাতা একখানা ডায়েরি। ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠার ডায়েরীর অধিকারীর নাম সন ও তারিখ। পরের চিঠি বা ডায়েরি পড়া হত খুব একটা গুরুতর অন্যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রীতিবালা শিক্ষিতা হইলেও এই নীতি মানিল না,—সে এই ডায়েরীখানা উপন্যাসের অধিক চিত্তাকর্ষক ভাবে কৌতূহলের সহিত পড়িয়া যাইতে লাগিল। এই কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়িয়াই এই বিজয়ই যে কমলার স্বামী তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। আনন্দে তাহার চক্ষে একটা দীপ্তি জাগিয়া উঠিল। সে আর একখানা পাতায় দেখিল লিখিত আছে—"আমি ভাবিতাম কমলাকে কখনও ভালবাসি নাই, অথচ এখন মনের সহিত মিলাইয়া দেখিতেছি যে তাহা ঠিক নয়।

লীলা—শিক্ষিতা, তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্ম, তাহাকে পাইবার আশা একটা অলীক কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবু সত্য কথা বলিতে কি আমি লীলাকে ভালবাসি। কমলার কথা কল্পনার-লীলার কথা বাস্তবের। যাক্—নারী চরিত্রে আমার বিশ্বাস নাই। পরের জন্য দেশের জন্য যে কাজ তাহাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, আমি তাহাই করিব।"

শচীন্দ্র কাছারীতে গিয়াছে। কমলা পাশের ঘরে শেলাইয়ের কলের কাছে বসিয়া কি করিতেছে। রাধাকান্ত বাবু ঘুমাইতেছেন। প্রীতিবালা একে একে ডায়েরীর সবগুলি পাতা পড়িয়া ফেলিল। তাহার একবার মনে হইতেছিল যে কমলাকে সব কটা পাতা পড়িয়া শোনায়, পরে আবার ভাবিল সেটা ঠিক্ হইবে না। স্ত্রীলোক হাজার হইলেও স্বামী অন্য নারীর প্রতি অনুরাগী এ কথা কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিবে না। এমন একটা কৌশল করিতে হইবে, যাহাতে দু'টি পাখীই ফাঁদে জড়াইতে পারে। এখন কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত। প্রীতিবালা সব কথা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তবে পরিচয় যখন স্থির জানা গেল, তখন আর বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

সে হঠাৎ আর একখানা পুঁথি নাড়াচাড়া করিতেই দেখিতে পাইল যে একখানা ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফখানা একটী নব্য শিক্ষিতা রমণীর। ফটোর নীচে লেখা রহিয়াছে—'জন্মদিনের প্রীতি-উপহার শ্রীলীলাদেবী।' প্রীতিবালা বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোকচিত্রখানি দেখিয়া কহিল—"সুন্দরী বটে। তা হ'লে দেখছি

বিজয় বাবুর প্রেমটা লীলার দিকে বেশ একটু ঝুঁকে পড়েছে। একবার আসুন কাছারী থেকে আজই একটা ফন্দী আঁটতে হবে। এখানেও অভাবনীয়রূপে একটা পথের সন্ধান পাইয়া তাহার চিত্ত আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। সে সমুদয় কাগজপত্রগুলি যত্নের সহিত নিজের বাক্সে রাখিয়া দিল, ভয় পাছে বাড়ীর কর্ত্তাটি হঠাৎ সজাগ হইয়া এসব দেরাজ, টেবিল সরাইয়া নিতে চাহে, তাহা হইলে যে তাহার প্রমাণ প্রয়োগের দলিলপত্র সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কমলা পাশের ঘরে সেলাই করিতেছিল বটে, কিন্তু মন যেন লাগিতেছিল না। এত দিন সে জীবনে যাহা অনুভব করে নাই এখন তাহা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে স্বামীর প্রেম নারীর জীবনকে কত বড় মধুময় করিয়া তোলে যে নারীর সে অভিজ্ঞতা নাই তাহার পক্ষে তাহা বোঝা অসম্ভব। কমলা যে অপমানের জ্বালায় হৃদয়ে অনুতাপের আগুন জ্বালিয়াছে, সে আগুন যে কিছুতেই নিবিতে চাহে না। নীরবে যখন সে একা বসিয়া থাকে তখন যে আগুনের জ্বালা বড় তীব্র হইয়া উঠে। একদিন যে তাহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে। কিন্তু সে কোথায়? আজ সে কোনরূপেই মন্মথের ব্যবহারের কথা মার্জ্জনা করিতে পারিতে ছিল না, কেন তাহার এমন ভুল হইল? কেন—কেন সে এমন করিয়া আপনার সম্ভ্রম ও গৌরব বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছিল? কমলা যখন ঐরূপ একমনে নানা কথা চিন্তা করিতেছে, ঠিক সেই সময়ে প্রীতিবালা আসিয়া কমলার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—"ওগো" কমল বালা—শুনচ? বলি আর বিরহ বেদনা সইতে হ'বে না। এখন আমায় কি বক্‌সিস্ দিবি বল্?"

কমলা ঘাড় ফিরাইয়া কহিল—"বৌদিদি যে আজ বড় দিগ্বিজয়ী বীরের মত হুঙ্কার ছাড়চ। বলি—কান্দাহার কি কাম্‌স্‌কট্‌কা জয় করে এলে নাকি ?"

'ওলো আর ঠাট্টা কর্‌তে হবে না। এখন শোন্‌ এ হাসির কথা নয়।'

"কি রকম ?"

'আর লুকুতে হ'বে না। বড্ড ধরিছি। ঠিক্‌ কিনা বল্‌।"

কমলা অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে কহিল, 'সত্যি বৌ'দি আমি দিব্যি করে বল্‌ছি তোমার কোন হেঁয়ালি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। কি হয়েছে বল না ?"

প্রীতিবালা হঠাৎ তাহার হাস্য পরিহাসের ভাব দূর করিয়া দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, "সত্যিই নাকি ? আচ্ছা তাহ'লে শোন আমিই তোমায় নূতন খবর দিই, কিন্তু সাবধান যদি আমার কথা মত না চলিস্‌, তাহ'লে কিন্তু কোন মতেই বল্‌ব না, যদি দিব্যি কর, তাহ'লে বল্‌তে রাজি আছি।'

আচ্ছা! দিব্যি কচ্ছি। "সরলা শিশুর মত কমলা, প্রীতিবালার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া উৎসুক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "বলনা বৌ'দি! কি বল্‌বে বল।"

প্রীতিবালা কমলার দিকে স্নেহভরে নয়ন ফিরাইয়া একে একে তাহার আবিষ্কৃত সমুদয় কথা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। কমলা সব কথা শুনিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—'বৌ'দি! তুমি আমার জন্য কেন এত কষ্ট কচ্ছ ? তুমি জাননা, আমি

কত বড় পাপী, আমি তাঁর কত বড় অযোগ্য! তার কোন অপরাধ নেই।"

"অপরাধ নেই?—নিশ্চয়ই আছে। হাজার হ'লেও তুমি রমণী। তাঁর কি কোন কর্ত্তব্য নেই। পুরুষের কি নিজ স্ত্রীর প্রতি একটা দায়িত্ব নাই; এ অন্যায় কথা কেন বল কমল! উনি এলেই আমি সব বল্‌বো; আর বিজয়বাবু ত সন্ধ্যের সময় একবার আস্‌বেন, আর গোপন কেন? আমি যাই বাবাকে বলিগে তিনি খুব খুসী হবেন! আমি যাই"—

কমলা গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিল—"বৌদি!"

"সে হয় না কমল, আজ আর তোমার কোন কথা শুনবো না।"

"বৌদি"—

"না আর কোন কথা শুন্‌বো না, একবার আরসীতে মুখখানা দেখ দিকি, তা হ'লেই বুঝ্‌তে পারবে।"

কমলা উন্মত্তের মত আকুল কণ্ঠে কহিল—"বৌদি আমার অন্তরের জ্বালা তুমি কি বুঝবে বল! তুমি ত জাননা যে কি আগুণে পুড়ছি। সে আগুণ যে নিবিবার নয়। সে সব কথা একদিন তোমায় বল্‌বো, কিন্তু আজ নয়।"

"কি জানি ভাই, তোমাদের কোন হেঁয়ালি বুঝতে পারি না। তবে আমিও বলে রাখছি, তোমাদের এ মিলন ঘটাবই ঘটাব, নইলে আমার নাম প্রীতিবালাই নয়! আর শোন,—যে কথা পরে বল্‌বে, সে কথা এখন বল্‌লেই বা কি দোষ?"

এমন সময় ঘরে জুতার শব্দ শোনা গেল। কমলা ব্যস্ত

ভাবে কহিল "বৌ'দি! বোধ হয় দাদা এসেছেন, তুমি যাও।" প্রীতিবালা কমলার দিকে ঈষৎ কোপ কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

কমলা শয্যায় লোটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

একত্রিশ

সন্ধ্যাবেলা ব্রজবাবু মিঃ চৌধুরীর বাসায় আসিয়া দেখিলেন, রাধাকান্ত বাবু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মিঃ চৌধুরী সেখানে আসেন নাই। ব্রজবাবু রাধাকান্ত বাবুকে কহিলেন—"মশাই অবাক্ হয়েছি, আশ্চর্য্য হ'য়েছি, সকলের উপর অবসন্ন হ'য়ে পড়েছি, কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছি না।"

রাধাকান্ত বাবু বিষণ্ণ স্বরে কহিলেন—"কি রকম?"

"কি রকম? দেখুন, এই পাঁচ বৎসর বিজয় এখানে এসেছে, আমি কি বল্‌বো, ওকে আমার ছেলের চেয়ে কোন অংশে কম করে দেখিনি, আর গিন্নিত বিজয় বল্‌তেই অজ্ঞান! এই মামলায় আমাকে আজ রীতিমত বিপন্ন হ'তে হয়েছে। মিঃ চৌধুরীকে ভাল রকমে সাহায্য কর্‌তে পারিনি। কি যে হলো, কেন সে পালিয়ে গেল, কোথায় যে গেল জান্‌তে পারলুম না। আর ওর ত্রিসংসারেত কেউ নেই, এই যে বাড়ী দেখছেন, সেওত আমি জোর করে তৈরি করে দিয়েছি। ওরত ঠাকুর চাকর নিয়েই সংসার। তবে এখন কোথায় গেল?"

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন "তাইত, আচ্ছা বিজয় বাবুর বাড়ী ঘরের কোন সংবাদ রাখেন?"

'একটু একটু রাখি বই কি।"

"বিজয় বাবু কি আদৌ বিয়ে করেন নি ?"

'করেছিলেন রাধাকান্ত বাবু, কিন্তু স্ত্রীটির বিবাহের অল্প কয়েক বছর পরেই মৃত্যু হয়, তারপর আর সে বিবাহ করে নাই। কি বল্‌বো, এমন চরিত্রবান্ এমন মধুর প্রকৃতির লোক আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। অনেক বলেছিলুম, কিন্তু কোন মতেই রাজি কর্‌তে পারি নাই।"

'বাড়ী কোথায়, কোন্ জেলায় জানেন কি ?'

'খুব জানি' ওঁর বাপ একজন খুব নামকরা পণ্ডিত ছিলেন; ঢাকা জেলার মধ্যে এমন নামজাদা পণ্ডিত আর এখন কেউ নেই ?'

এইবার রাধাকান্ত বাবু উৎসুক চিত্তে ঈষৎ হর্ষভরে কহিলেন "বিজয় বাবুর পিতার নাম কি আপনার জানা আছে ?"

'নিশ্চয় ; তাঁর নাম ছিল রামনিধি ন্যায় পঞ্চানন।

রাধাকান্ত বাবু বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ব্রজ বাবু"

ব্রজবাবু তাঁহার এইরূপ অস্বাভাবিক স্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন"—আজ্ঞে।"

ব্রজ বাবু, এই বিজয় আমারই জামাতা। আর আমার কন্যা মৃতা নহে সে এখনও জীবিতা।'

ব্রজ বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি রকম ?"

অভিমানী—দাম্ভিক, রাধাকান্ত বাবুর অভিমান কোথায় চলিয়া গেল! অপরাধী যেমন নিজের অপরাধ স্বীকার করিলে যদি মুক্তি পাওয়া যায় সেই আশায় উন্মুক্ত হৃদয়ে সব কথা বলিয়া ফেলে, তেমনি

ভাবে মুক্তকণ্ঠে রাধাকান্ত বাবু আনুপূর্ব্বিক সব কথা বলিয়া গেলেন। ব্রজ বাবু চুপ করিয়া নিবিষ্ট ভাবে সব কথা শুনিয়া কহিলেন—"আমি শুনে খুব দুঃখিত হচ্চি রাধাকান্ত বাবু; আমি যদি আগে এর বিন্দু বিসর্গও জান্তে পারতুম, তাহ'লে কখখনও বিজয়কে সঙ্গ ছাড়া করতুম না।"

অশ্রু জলের প্লাবনে রাধাকান্ত বাবুর বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল, তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইতেছিল না। উৰ্দ্ধে আঙ্গুল দেখাইয়া কহিলেন—'ব্রজ বাবু, জীবনে যে ভুল করেছি, জানি না সে আর সংশোধন করে যেতে পার্‌বো কি না। গৃহিণী এই দুঃখে অকালে চলে গেলেন। যে দম্ভে আমি বিজয়কে হেলা করেছি, আজ সেই দম্ভ চূর্ণ হয়েছে, হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে, তবুও যদি একবার তাকে পাবার সম্ভাবনা হত আমি সব অভিমান ভাসিয়ে দিতুম।" এই বলিয়া রাধাকান্ত বাবু হঠাৎ ব্রজবাবুর হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—'কি করবো, আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

বৃদ্ধের এই অশ্রু বিগলিত কণ্ঠের বাণী ব্রজ বাবুর হৃদয়ে এমনি ভাবে আঘাত করিল যে তিনি করুণ কণ্ঠে কহিলেন "আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না, কুণ্ঠিত হবেন না, বিজয়কে আমি এই ক'বছর দেখে যত দুর বুঝ্‌তে পেরেছি তাতে আপনাকে জোর করে বল্‌তে পারি যে আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'বে, সেত তেমন ছেলে নয় যে আমাদের হৃদয়ে আঘাত কর্‌বে। ভাল কথা আপনারা কি বিজয়কে দেখে চিন্‌তে পারেন নি? তাহলে কি এমন হতো?"

"কিছু না, অমন কোন কল্পনাও আমার মনে আসেনি। বৌমা

ওর কাগজ পত্তর ঘেঁটে এই সত্যটি আবিষ্কার করেছেন। আমারও যে একটু সন্দেহ না হয়েছিল তা নয়, তবে কি জানেন এত দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ কি করে চিনে নেওয়া যায়? কমলা বিয়ের পর দু'একবারের বেশী দেখেছে বলে ত মনে হয় না। আর সে বিজয়কে চিনতে পেরেছে বলেও আমার বিশ্বাস হয় না।"

ভগবান মানুষের গর্ব্ব ও অভিমান যে কেমন করিয়া দূর করিয়াছেন সে কথা মানুষের বুদ্ধির অগোচর। তাঁহাদের দু'জনের কথার মাঝখানে শচীন্ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাধাকান্ত বাবু ব্রজ বাবুর সমক্ষে সব কথা শচীনকে বলিলেন—শচীন মনোযোগের সহিত সব কথা শুনিয়া কহিল—"ব্রজ বাবু, বাবার জীবনের শেষভাগে তাঁর যাতে শান্তি হয় সে ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। বিজয় বাবু কোথায় গেছেন, সে খোঁজ করাটা ত আমার কাছে কোন মতেই তেমন কষ্ট সাধ্য ব্যাপার বলে মনে হচ্চে না। চলুন না একবার ষ্টেসনে যাই, বিজয় বাবুকে ষ্টেসনের লোকেরা অবশ্যিই জানেন, তাঁরা কি কোন একটা সংবাদ দিতে পারবেন না?"

শচীনের এই কথাগুলি রাধাকান্ত বাবু ও ব্রজ বাবু উভয়েই সমীচীন বোধ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ষ্টেশনে গেলেন। প্রকৃত পক্ষেই শচীনের অনুমান ঠিক্ হইল,—একজন বাঙ্গালী টিকিট কালেক্টার ব্রজ বাবুকে দেখিয়া কহিলেন "ব্রজ বাবু, এই মোকদ্দমা ফেলে বিজয় বাবু হঠাৎ পুরী গেলেন কেন?"

বিচক্ষণ ব্রজ বাবু সেখানে কোন কথা বলা অনাবশ্যক বোধে হাসিয়া কহিলেন "মোকদ্দমারই একটু দরকারী তদ্বিরে।"

মিঃ চৌধুরী ও রাধাকান্ত বাবু প্ল্যাটফরমে পাইচারী করিতেছিলেন। ব্রজ বাবু একটু হাঁসিয়া বলিলেন "শ্রীমান্ বিজয় পুরী ধামে পালিয়েছেন।"

রাধাকান্তবাবু ব্রজবাবুকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া কহিলেন—"আপনি চিরজীবন শান্তিতে অতিবাহিত করুন। আপনার কল্যাণ হউক।"

বত্রিশ

মাঘী পূর্ণিমায় পুরীধামে যাত্রীর ভিড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিজয় আসিয়া পুরীতে পঁহুছিল। একটা সাহেবী হোটেলে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াই সে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া বাহির হইল। রৌদ্র তখন সমুদ্রের নীল বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বিজয় পুরী আর কখনও দেখে নাই। সমুদ্রের জলে স্নান করিবার জন্য বহু নরনারী স্নানের পোষাকে সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। সমুদ্রের ধারে সারি সারি বাড়ী। বিজয় অনিমেষ নয়নে চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে যাইতেছে, কোন বিশেষ মানুষ বা পদার্থের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ নহে। এমন সময়ে সম্মুখ হইতে কে যেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"কে? বিজয় বাবু যে, নমস্কার, ভাল আছেন ত?" বিজয় এই অপরিচিত স্থানে এইরূপ সম্বোধনে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল সম্মুখে নরেন্দ্র বাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সে তাড়াতাড়ি নত শিরে তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া কহিল—"আপনি এখানে কবে এলেন?"

নরেন্দ্র বাবু হাসিয়া কহিলেন—"আপনিত আর আমাদের খোঁজ নেন না! আমি আজ দু'বছর হলো এখানে একখানা বাড়ী করেছি। মিস্ রায়, আমার পুত্র বধূ নাতি নাতিনি ওরা সব এখানেই আছেন।"

বিজয় উৎফুল্ল চিত্তে কহিল—"ওয়ালটেয়ার কতদিন হ'ল ছেড়েছেন?"

"এই সবে দু'মাস।"

"বরদা বাবুও কি এখানে আছেন?"

নরেন্দ্র বাবু কহিলেন "শীঘ্র যে আসছেন তাত মনে হয় না, তিনি সম্প্রতি কল্কাতা আছেন। তা আপনি কতদিন হল এখানে এসেছেন?

বিজয় হাসিয়া কহিল "এই ঘণ্টা দুই মাত্র।'

"কোথায় উঠেছেন?"

'ঐ সাহেবদের হোটেলে।

নরেন্দ্র বাবু হাসিয়া কহিলেন "সে কোন মতেই হচ্চে না বিজয় বাবু, এই গরিবের কুটিরে আসতেই হবে। আপনি কতদিন এখানে আছেন?"

"কিছু ঠিক্ নেই।"

'তা বেশ। আপনার ত আজকাল ওদেশে খুব নামডাক, মাম্লা মোকদ্দমা ফেলে এসময়ে হঠাৎ এলেন যে?"

"আমার ত আর সংসারধর্ম্ম নেই, একা মানুষ খুব বেশী টাকারত দরকার নেই।"

নরেনবাবু বিজয়কে তাহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া কহিলেন—'চলুন বিজয়বাবু, এক্ষুণি চলুন, আমি বাড়ীগিয়ে হোটেলে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার জিনিষ পত্তর সব নিয়ে আস্‌বে এখন।"

বিজয় ধন্যবাদ জানাইয়া কহিল—"মাপ্‌ কর্‌বেন নরেনবাবু, আর ঋণের মাত্রা বাড়াবেন না।'

নরেন্দ্রবাবু একটু বিমর্ষ হইয়া কহিলেন—"এতটা বয়েস হয়েছে, একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে জীবনে কেউ কোনদিন স্নেহের দয়ার বা প্রেমের ঋণ শোধ কর্‌তে পারে না।"

নরেন্দ্রবাবুর বিমর্ষ ভাব লক্ষ করিয়া কহিল—"আচ্ছা, আপনাদের ওখানেই চলে আস্‌ব।"

এই বলিয়া বিজয় হোটেলের দিকে চলিয়া গেল। নরেন্দ্রবাবু ও তাহার বাটীর দিকে চলিলেন।

নরেন্দ্রবাবু তাঁহার বাড়ী যাইয়া বিজয়ের এইরূপ আকস্মিক আগমনের কথা প্রচার করায় সকলেই সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। লীলার হৃদয়ের ভিতর দিয়া যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিয়া গেল।

বিমলা ও লীলার মধ্যে এতদিনে সখীত্ব ভাব দৃঢ়রূপেই আবদ্ধ হইয়াছিল। বিমলা যেমন প্রতিনিয়ত লীলার উপদেশ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিত না তেমনি লীলাও আর কোন কথাই তাহাকে গোপন করিত না। বিজয়ের সহিত তাহার পত্র ব্যবহার, বিজয়ের প্রতি তাহার অনুরাগ নানারূপে নানাভাবে সুচতুরা বিমলার নিকট প্রকাশ পাইয়াছিল। নরেন্দ্র বাবুর নিকট,

বিজয়ের আগমনের কথা শুনিয়া বিমলা হাসিয়া লীলাকে কহিল—"এইবার।"

লীলা সলজ্জ-ভাবে কহিল—"কি এইবার বোন্?"

'কি আর লুকুতে হবে না, এইবার তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ খাব আর কি?

দুই সখীর ভিতরে যখন এইরূপ সরস হাস্য কৌতুক চলিতেছিল, সেই সময়ে বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল—"একজন বাবু এসেছেন, কর্ত্তাবাবু আপনাদের সেখানে যেতে বলেছেন।" বিমলা আবার হাস্য করিয়া কহিল—'সেজে গুজে এস বোন্। লীলা কহিল 'কারজন্যে? বিমলা কৌতুকে ভরে কহিল—'সেকি আর আমি জানি ভাই, সে তোমার মনই জানে।"

বাহিরের ঘরেব সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বিজয় ও নরেন্দ্রবাবু তখন অনেক কথার আলোচনা করিতেছিলেন। বিজয় একে একে তাঁহার জীবনের উন্নতির সব কথা তাঁহাকে বলিতেছিল। নরেন্দ্রবাবু পরম প্রীতি ও আনন্দের সহিত সে সব কথা শুনিয়া কহিলেন—"দেখুন, শুভকার্য্যে সংসারে যত বাধা বিঘ্ন ঘটে এমন আর কিছুতেই হয় না, আর নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর যত বেশী নির্ভর কর্‌বেন, ততই জগতে মানুষের মত মানুষ হতে পারবেন।"

এইরূপ সময়ে লীলা ও বিমলা সেই কক্ষে প্রবেশ করতেই বিজয় দাঁড়াইয়া তাহাদের অভিবাদন করিল। লীলার সাহচর্য্যে বিমলার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার মনের মধ্যে একটা সতেজ সাহস ও শিক্ষার ঔদার্য্য দেখা দিয়াছিল। সে আর অন্তঃপুরবদ্ধা ক্ষুদ্রা

দুর্ব্বলা নারীর ন্যায় সংকীর্ণতার নাগপাশে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে-ছিল না। নরেন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে হাস্যমুখে বিজয় উত্তর করিল- "আপনাদের ন্যায় প্রাচীন ব্যক্তির মুখে এইরূপ উদার কথা শুনলে বাস্তবিক পরম আনন্দের কারণ হয়।"

বিমলা বিস্মিত মুখে কহিল 'আপনাদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে এসে বোধ হয় অনেকটা রস ভঙ্গ করে দিলুম, কেমন নয় বিজয়বাবু ?"

সেবার বিজয়ের সহিত বিমলার তেমন ভাবে আলাপের সুযোগ ঘটে নাই, এইবার সেই সুযোগ পাইয়া সত্য সত্যই তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

বিজয় বিমলার প্রতি শ্রদ্ধা-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল— 'কিছু নয়, বরং আপনাদের না আসা পর্য্যন্ত যেন কোন রকমেই আনন্দ পাচ্ছিলুম না। "তা ত বটেই"—একথা কহিয়া সে লীলার দিকে একটুকু সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বিজয় ও লীলার বহুদিন পরে আজ পুনরায় সাক্ষাৎ। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে দুইটী প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয় যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন তাহাদের ভাষা বহুস্থলেই নীরব হইয়া পড়ে। বিজয় তাহার দৃষ্টি কোনরূপেই লীলার দিক্ হইতে ফিরাইয়া লইতে পারিতেছিল না। লীলার ওষ্ঠাধর কম্পিত, মুখে গোলাপের পাপ ড়ির মত লোহিত আভা ও সলজ্জ দৃষ্টি বিনিময় এমনি ভাবে তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছিল যে তাহার একান্ত আগ্রহ সত্বেও সাহসিককতার সহিত এই বাক্যা-লোচনার সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলিতে পারিতেছিল না। যে ধরা দিয়া দশজনের কাছে লাঞ্ছিত হইতে চাহে না, সেই কিন্তু অতি সহজে ধরা

পড়িয়া যায়। বিমলা তাহার এই পরিবর্ত্তন পরম আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেছিল। নরেন্দ্রবাবু হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন —'বৌমা, তাইত অনেকটা বেলা হ'য়ে গেছে ; আমারা যে অতিথির দিকে একবারও ফিরেও চাইলাম না, ওঁকে একটু বিশ্রাম করবার সুযোগ করে দিলে না ?"

এই কথার উত্তরে বিমলা কহিল—'নিশ্চয়, লীলা তুমি বিজয় বাবুর সঙ্গে একটু গল্প কর, আমি এখনি সব বন্দোবস্ত করে ফিরে আস্‌ছি।" লীলা ও তাহাদের সঙ্গে উঠিয়া পলাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু সুচতুরা বিমলা এমনি চতুরতার সহিত তাহার পলাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া নরেন্দ্রবাবুর সহিত চলিয়া গেল যে তাহার আর কোন কথা বলিবার অবকাশ বা পালাইবার পন্থা রহিল না। লীলা বস্তুতঃই একটা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেল। 'অতিথিকে —জীবনরক্ষাকর্ত্তাকে এইরূপ ভাবে ফেলিয়া যাওয়া যখন সম্পূর্ণরূপ অসঙ্গত তখন আর কি করা যায়। এইবার লীলা ধীর কণ্ঠে কহিল— "কেমন আছেন বিজয়বাবু, আপনার সহিত এইভাবে যে হঠাৎ আবার দেখা হবে সে কথা আমি কখনও কল্পনা কর্‌তে পারি নাই—আর সময়াভাবে সুবিধামত চিঠি লিখ্‌তেও পারিনি। সেজন্য সত্য সত্যই খুব অন্যায় করেছি বলে মনে হচ্চে।"

বিজয় কহিল—'কখনও না, আপনি অনুগ্রহ করে আমার খোঁজ খবর নেন সেটা আপনার অসীম মহত্ত্বের পরিচয়। নচেৎ আপনার উপর আমার কি এমন অধিকার অধিকার আছে যে আপনার কোনও ব্যবহারে আমি অন্তরে একটা অতৃপ্তির ভাব পোষণ করতে পারি ?

লীলার প্রাণের তারে বিজয়ের এই অভিমান আসা যেন কত বড় একটা মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিল। এ সামান্য দুটী কথার বিজয় যে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল। লীলাও ভাবিল, তাইত কি এমন অধিকার, অধিকার কিছুই নাই, অথচ যেন কি এক আকর্ষণে, কি অদৃশ্য শক্তিতে তাহাকে পরিচালিত করিয়া দিয়া তাহার অন্তর হইতে বলাইতে চাহে "ওগো! সব অধিকারে। তুমিই যে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিয়া আমাকে দুঃসহ অভিমানের ভিতর টানিয়া আনিতেছে। এত কথা ত আর ভাষার মূলে কণ্ঠের বানীতে ফুটিতে পারে না তাই লীলা হাস্য করিয়া ধীরে গম্ভীর ভাবে কহিল—"কিসের অধিকার বিজয়বাবু? জীবন রক্ষার অধিকার, প্রাণ দাতার অধিকার, মহাপ্রাণতার অধিকার।"

বিজয় লজ্জিত হইয়া কহিল—'এইরূপ ভাবে লজ্জা দিলে কিন্তু আমাকে এক্ষুণি পালাতে হবে।"

'সে অভ্যাস ত আপনার আছেই, বেশ ও কথা আর তুলবো না, তা আপনি ত আমায় লজ্জাদিতে ছাড়লেন না।'

'তাহলে ও সব প্রসঙ্গ এখানেই ক্ষান্ত হউক—আপোষ হ'য়ে যাক্ কেমন, রাজি আছেন ত?

লীলা হাসিয়া কহিল "খুব রাজি—তা বেশ এখন বলুন এখানে কদিন থাক্‌বেন।"

"সে ঠিক্ নেই, তবে এখানে যে খুব বেশীদিন নেই তাও নিশ্চিত। পুরী আর কখনও আসিনি, যাকিছু দেখ্‌বার দেখে শুনে—আপনি যদি দয়া করে Guide হয়ে সবটা দেখিয়ে দেন তাহলে বড়ই আনন্দিত হব। আপনার চিঠিতে জান্‌তুম যে আপনারা

এখানে আছেন, তবু কেমন ভোলামন আস্‌বার সময় কিংবা এখানে পৌঁছে সে সব একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম।'

"তবে আমাদের কথা মনে পড়ে গেল কি করে?' বিজয় তখন নরেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাতের আদ্যোপান্ত সমুদয় ইতিহাস বর্ণনা করিল লীলা শুনিয়া কহিল—"তবু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল নতুবা আমরা যে আপনার দর্শন পেতুম না সে কথা খুব নিশ্চিত। ঠিক্ কিনা বলুন ত বিজয়বাবু?"

এই জেরার উত্তরে বিজয় চুপ করিয়া রহিল, তাহার মুখে ঠিক্ উত্তর যোগাইতেছিল না। সে খানিক পরে কহিল—'ঠিক্ কিনা বল্‌তে পারি না। তবে আপনারা এখানে আছেন একথা জেনে শুনে কখনও যে একবার দেখা করতুম না, তত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই।'

এইবার লীলা কহিল—'উঃ কি স্বার্থপর, আমি আপনার সঙ্গে কেবলি কথা কাটাকাটি কচ্চি আর দোষের বোঝা চাপিয়ে দিচ্চি, কিন্তু আপনার সুখ সুবিধার কথাও একবারও মনে কচ্চি না, আপনি এই বেলা একটু বিশ্রাম করুন।" লীলা ধীরে ধীরে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিজয় এক দৃষ্টিতে তাহার গতিভঙ্গী দেখিতেছিল। লীলার রূপ এখন যেন শ্রাবণের ভরা নদীর ন্যায় কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে যতক্ষণ বসিয়াছিল তাহার নিকট মনে হইতেছিল যেন একখানি জীবন্ত প্রতিমা শতরূপে শতভাবে তাহাকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও পলে পলে নিকটে আহ্বান করিতেছে।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে জড় প্রকৃতি সংজ্ঞাহীন স্তব্ধের মত অজ্ঞাতে

আকুলতা জ্ঞাপন করিতেছে। সমুদ্রের অমল-ধবল সিকতা শয্যায় অশ্রান্ত তরঙ্গশিশু অক্লান্তভাবে আছাড়িয়া পড়িতেছে। চক্রপথ রেখায় সমীমলিন চিহ্নটুকু মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে উজ্জ্বল আকাশ ঘননীল পরিষ্কার। ঊর্দ্ধে নীলের অনন্ত মাধুরী আর নিম্নে নীলের অশ্রান্ত লহরী। তীরে শ্যামল মাধুরী। বিজয় আহারান্তে চুপ করিয়া করিয়া বিছানায় অঙ্গ এইলাইয়া নানা কথা চিন্তা করিতেছিল, সহসা সে বিছানা ছাড়িয়া টেবিলের পাশে বসিয়া ব্রজবাবুকে চিঠি লিখিতে বসিল। যে ব্রজবাবু তাহাকে পক্ষীশাবকের মত বুকে করিয়া সুদূর প্রবাসে ভীষণ দুর্দ্দিনের মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন, একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবককে খ্যাতিমান ও জনগণের শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছেন, সে কি না সেই পরম হিতৈষী মহাজনকে তাঁহার সঙ্কট সময়ে বিপন্ন করিয়া চোরের মত ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। ইহা কি পুরুষত্ব না মনুষ্যত্ব। বিজয় দৃঢ়ভাবে বলিষ্ঠ হৃদয়ে ব্রজবাবুর নিকট তাহার জীবনের যে ইতিহাস, দীর্ঘকাল গুপ্ত রাখিয়াছিল তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া দীর্ঘ এক লিপি লিখিয়া ফেলিল, তাহাতে সে কোন কথাই গোপন করিল না, একরূপ এই দীর্ঘ চিঠিখানা তাহার আত্মজীবন চরিতের আকার ধারণ করিল,—সে শুধু ইহা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইল না, নিজ হস্তে ডাকঘরে যাইয়া পোষ্ট বক্সে ফেলিয়া দিয়া তবে সে স্বোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

তেত্রিশ

কমলার কাছে এতকাল যে সকল কাহিনী গোপন রাখিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে পরামর্শ চলিতেছিল, শেষটায় যখন আর তাহার কোনও প্রয়োজন রহিল না তখন রাধাকান্ত বাবু কহিলেন "কমল, । এইবার মা তুমি যদি না অগ্রসর হও তা হ'লে যে কোন রকমেই আর আমার গৌরব থাকে না।"

কমলা নত শিরে পিতার কথা শুনিয়া কহিল—"বাবা, তোমার আজ্ঞা, তোমার বাক্য কোন দিন হেলা করি নাই,—কিন্তু এইবার বুঝি আমাকে তোমার অবাধ্য হ'তে হয়।"

রাধাকান্ত বাবু বাধা দিয়া স্থির চিত্তে দৃঢ়কণ্ঠে সহানুভূতির সুরে কহিলেন, "কেন মা ?"

'কেন বাবা, সে যে অনেক কথা, একদিন তোমার বাক্য আমার কাছে যে কত বড় ছিল সে ত তোমার অজ্ঞাত নেই, কিন্তু আজ যে সে সব কথা বল্‌তেও আমার লজ্জায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে।'

রাধাকান্ত বাবু ধীরে ধীরে কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—"কোন অপরাধ হবে না তোমার, কোন অন্যায় হবে না তোমার, বল না কি বল্‌বে বল।"

কমলা ভগ্ন কণ্ঠে শুষ্ক হাসিয়া কহিল—"তিনি আমায় গ্রহণ কর্‌তে পারেন না, আমি তাঁর গ্রহণের অযোগ্য, তুমি কি বাবা এই অপমানটাকে নীরবে সহ্য কর্‌তে পারবে ? একদিন তুমি যে

অপমানকে খুব বড় বলে মনে করেছিলে, এ কি তার চেয়ে অনেক বড় নয় ?"

রাধাকান্ত বাবু খানিক নীরব থাকিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল "কেন পারবে না মা, বিজয় যে বিষ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হ'য়েছে, তার চেয়ে যে এ অপমানের জ্বালা অনেক কম হ'বে। কিন্তু এও জানিস্ আমার মন বল্‌ছে, বিজয় তোকে গ্রহণ করবেই, তাকে আমি অবহেলা করলেও তাকে, আমি চিনি।"

কমলা ধীর স্বরে কহিল—"মানুষের মন, সে কি চিরদিন সমান থাকে ? পরিবর্ত্তন কি একেবারেই অসম্ভব ?"

'তাত নয়ই তবে একেবারে সবই বদ্‌লে যায় তাও ত সম্ভব নয়।'

"তবে বাবা, তোমার এ পরিবর্ত্তন কেন ? তুমি কেন আজ আমার জন্য ব্যাকুল হচ্চ ?"

"সে কি করে বুঝাব কমল ! দিনগুলি যত ঘনিয়ে আস্‌ছে ততই যেন একদিন যে কাজকে খুব সঙ্গত বলে দর্পের সহিত সম্পন্ন করেছি, সে সব অন্যায় বলে আজ অনুতাপে দগ্ধ হচ্চি।'

'বাবা কেন তুমি আমায় এমন করে লজ্জা দিচ্ছ, আমিত কোন দিন তোমার বাক্যের অমর্য্যাদা করিনি, তবে এখন আমার আর সাহস নেই, হৃদয়ের বল নেই, সব অপমান সহ্য করেছি, এখনও সইতে প্রস্তুত, কিন্তু তোমার অপমান সইতে পারবোনা বাবা।"

"সে ভাবনা তোমার ভাব্‌তে হবে না মা। শুধু আমায় বল— আমার কর্ত্তব্য শেষ করে ফেলি তারপর বিদায় নিয়ে সংসারের সব কথা ভুলে যাই।"

কমলা কহিল— "আমায় কি করতে হবে বাবা? তোমার মনে আমি কোন কষ্ট দিব না, কিন্তু বড় ভয় পাই যদি তিনি আমায় হেলা করেন, গ্রহণ না করেন, তখন আমি কোথায় দাঁড়াব।'

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন—"তা হলে কমল! মায়ে আর ছেলেতে লোকালয় ছেড়ে মানুষের বাস যেখানে নেই তেমন কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেবো। ব্রজ বাবু বলেছেন—বিজয় না কি তাঁর কাছে এক চিঠি দিয়েছে, আজ সন্ধ্যের পর তিনি এলে পরে যা হয় একটা কর্ত্তব্য স্থির করে ফেল্‌বো আর কোন মতেই দেরী করা চল্‌ছে না।" কমলার হৃদয়ের ভিতর যে আগুন জ্বলিতেছিল তাহার নির্ব্বাণের পথ কি সে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তাহার প্রাণের জ্বালা কিসে যে নির্ব্বাপিত হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

চৌত্রিশ

বিজয়ের পত্রখানা পড়া শেষ হইলে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ব্রজ বাবু গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"তাইত বলি রাধাকান্ত বাবু, কেন বিজয় অমন করে চলে গেল। কি করবে সে, তার ত আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। পিতৃভক্ত পুত্র সকলের উপর পিতার আদেশকেই সকলের চেয়ে মহৎ বলে গ্রহণ করেছে। বর্ত্তমান যুগে এ দৃশ্য বড় গৌরবের বড় আনন্দের। এখন বুঝতে পাচ্ছি যে আমি যদি পূর্ব্বে এসব জানতুম তাহলে কখনও তাকে যেতে দিতুম না।

এখন কি করবো বলুন। আমাকেত চিঠির জবাব দিতেই মানা করেছে, সে কথাও ঠিক্, সে কোন্ দেশে কোথায় চলে যাবে, চিঠিই বা আর কত পথ খুঁজে বেড়াবে।”

শচীন্দ্র গর্ব্বের সহিত কহিল—“এমন মানুষ যে দেশে জন্মায় সেই দেশের গৌরব। যে পরিবারের সহিত এর সম্বন্ধ থাকে সে পরিবারেরও অহঙ্কার থাকে। বাবা, কোন দিন তোমার কোন কথার প্রতিবাদ করতে সাহসী হই নাই, কিন্তু আজ বল্‌ছি—মা আমার দেবী ছিলেন, তাঁর মনের ব্যথা আজ মূর্ত্তি ধরে এসে আমাদের তাড়না কচ্ছে, জানিনা কমলাকে সুখী করতে পারবো কি না ?”

রাধাকান্ত বাবু শচীন্দ্রের কথার কোনও উত্তর না দিয়া, ব্রজ বাবুকে কহিলেন’ আপনার এ বিষয়ে কি অভিমত ব্রজ বাবু ?’

ব্রজ বাবু কহিলেন—“এসময়ে কমলাকে পুরী পাঠান আমার মনে সঙ্গত বলে বোধ হচ্চে না। হয়ত বিজয়কে সেখানে পাবেন না, পেলেও হয়ত সে কোনরূপেই ধরা দিবে না।” তবে একটা কথা বল্‌তে চাই যদি আপনি সঙ্গত মনে করেন তাহলে বল্‌তে ইচ্ছা করি।”

রাধাকান্ত বাবু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—“কেন কুণ্ঠিত হচ্চেন ব্রজ বাবু, আপনি বলুন, আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শ আমি সাদরে গ্রহণ করবো। অবশ্য একদিন ছিল যেদিন আমি নিজেকে যত বড় বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান মনে করতুম এখন আর সংসারে কাকেও করতুম না, কিন্তু সেদিন আর নাই ব্রজ বাবু সেদিন আর নাই।”

‘তবে শুনুন, রাধাকান্ত বাবু, কমলাকে একবার বিজয়ের দেশে

পাঠালে হয় না ? তাহলে বিজয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, এবং নিশ্চয় বল্‌ছি আমি তাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবো। নইলে দূর হ'তে চেষ্টা কর্‌লে কোন ফলই হবে না।"

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন—"আপনার এ পরামর্শ যুক্তি সঙ্গত, আমি তাই কর্‌বো। শচীনের এখানে আরও অনেকদিন থাকতে থাক্‌তে হ'বে। আমি কালই কমলকে নিয়ে দেশে যাবো, সেখান থেকে লোকজন দিয়ে বিজয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো। কি বলেন ?"

মিঃ চৌধুরী কহিলেন—'এ পরামর্শ মন্দ নয়। তবে কি না সেখানে গিয়ে কমলার মাথা গুঁজবার মত যায়গা আছে কি না তাও যে সন্দেহ।'

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন, "আমি আমার কন্যা ও জামাতার বাসোপযোগী বাড়ী তৈরী কর্‌তে কোনরূপেই কুণ্ঠিত হব না।"

এইরূপ নানা কথা কাটাকাটির পর কমলার নন্দনপুর যাওয়াই স্থির হইল।

উপরের একখানা ঘরে বসিয়া কমলা চুপ্‌ করিয়া ভাবিতেছিল। মানুষ ঘটনা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া এইরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না।

নীচে যে পরামর্শ চলিতেছিল—সে কথার বিস্তারিত বিবরণ প্রীতিবালার অজ্ঞাত ছিল না এবং কমলারও জানা ছিল না। তাই রাত্রিতে রাধাকান্ত বাবু যখন দেশে যাইবার কথাটা সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে প্রস্তাব করিলেন তখন প্রথমে সে কথার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না। সে মৃদুস্বরে কহিল—"কেন বাবা,

এমন হঠাৎ চলে যাবে ? "কইএখানকার ত কিছুই দেখা হল না।" সে দেখবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটবে, আরও তিন চার মাস ধরে এ মোকদ্দমা চল্‌বে। আবার ঘুরে আস্‌ব।

কমলা কহিল—"তা আমার আবার কেন, আমার ত এ যায়গা ছেড়েই যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।" রাধাকান্ত বাবু কন্যার শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন—"তা হলে তোর এই বুড়ো অকর্ম্মণ্য ছেলেটাকে দেখবার ভার কে নেবে ? আমি মা বলে কাকে ডাক্‌বো। যে এত-দিন ভার নিয়েছিল, সে যে অনেক দূরে চলে গেছে। এ কথা কয়টির সহিত রাধাকান্ত বাবুর দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। কমলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল—"চল বাবা যেথায় যাবে চল।"

নরেন্দ্রবাবু বিমলাকে লইয়া বিশেষ প্রয়োজনে দেশে চলিয়া গিয়াছেন। সেথানে এতদিন বিমলা লীলার সহিত যেসকল জন হিতকর কার্য্য করিবার কল্পনা করিয়াছিল তাহারি পরিসমাপ্তির জন্য চলিয়া গিয়াছে। এই যাওয়ার ভিতর বিমলার কোনও ইচ্ছামত কৌশল যে না ছিল তাহা ত মনে হয় না। বরদাবাবু কয়েকদিন হইল পুরীতে আসিয়াছিলেন, অমলের সহিত অরুণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে বিবাহে শুধু দু'দিনের জন্য লীলা কলিকাতা গিয়াছিল। এথন বরদাবাবুর মন অনেকটা প্রশান্ত, মাতৃহীনা কন্যা দু'টীর একটীকে তাহার আকাঙ্ক্ষিত বরে অর্পণ করিতে পারায় তাঁহার চিত্ত আনন্দময়, কোনও অশান্তি আর তাহার নাই। বিজয়ের প্রতি তাঁহার যে কত বড় কৃতজ্ঞতা ও গভীরতম প্রাণের আকর্ষণ ছিল সে কথা লীলার অজ্ঞাত ছিল না। বরদাবাবু পুরীতে পদার্পণ করিয়া

বিজয়কে দেখিতে পাইয়া আনন্দ গদ গদ স্বরে কহিলেন—"বিজয় তোমাকে এখানে এরূপভাবে দেখ্‌তে পাব তা কল্পনাও কর্‌তে পারিনি তোমার মত ছেলে আমাদের দেশের আশা ভরসা ও গৌরব। আত্ম প্রশংসায় সঙ্কুচিত বিজয় কহিল—"আপনারা কি সকলেই আমাকে এমন করে লজ্জা দিবেন নাকি?" বরদাবাবু তাহার প্রাণ ভোলা সরল হাসিতে কক্ষখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিলেন—"এত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার মানুষ যদি ভাল কাজ করে তার প্রসংসাও কি কর্‌তে নাই নাকি?"

এখানে আসিয়া এইবার বিজয়ের সহিত ঘনিষ্টভাবে আলাপের সুযোগ ঘটায় বরদাবাবু এই যুবকটীর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইয়া প্রাণে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন।

সেদিন বিকেল বেলা বরদাবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। লীলা সাজ সজ্জা করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহারা প্রতিদিনই এইরূপ সময়ে বাহিরে বেড়াইতে যাইত। লীলা ঘর হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেই বিজয় আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। লীলা কহিল—'আজ কি বেড়াতে যাবে না নাকি?" তাহাদের কথাবার্ত্তা আপনি হইতে এখন তুমিতে দাঁড়াইয়াছে।

বিজয় একখানা কেদারার উপর বসিয়া কহিল—'না, আর কত কাল পথে পথে ঘুরে বেড়াব? লীলা এই মধুর ইঙ্গিত টুকুতে হাসিয়া কহিল—"তাহা হইলে চল না বাবার মত অতীন্দ্রিয়ের সন্ধানে অনন্তের পথে বিচরণ করি।"

বিজয় কহিল—"লীলা, জীবনটাকে আর অলক্ষ্য পথে টেনে নিয়ে

যে কোন মতেই চল্‌তে পারছি না—তথন প্রাণে একটা স্থির লক্ষ্যে পৌছবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। কোথায় যাই!" লীলার মনের ভিতর হইতে কত কথা যে উচ্ছ্বাসিত স্বরে বাহির হইবার জন্য ব্যাগ্র হইয়া উঠিতেছিল সে কথাগুলিকে সে কোনমতেই বাহির হইতে দিল না।

বিজয় কহিল—কোন্ পথে কোন্ ভাবে যে বিধাতা আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছেন সেকথা আমিই যে বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। আমার জীবনের প্রথমভাগে কত বড় বেদনা যে আমাকে আঘাত করেছে সে কথা বল্‌তেও যে আমার প্রাণে যে কত বড় অসহ্য যাতনা জাগ্রত হয়ে উঠে একদিন সেকথা তোমাকে বল্‌ব।" বিজয় লীলার সুকোমল হাত দু'খানি নিজের মুঠোর ভিতর চাপিয়া ধরিয়া কহিল—'লীলা! তুমি কি আমাকে কোন্ পথে সান্ত্বনা, সে পথের সন্ধান বলে দেবে না?'

লীলার হৃদয় প্রেমে গলিয়া গিয়াছিল—সে কহিল—"অতীতের কথা জান্‌বার জন্যে আমার কোন ব্যাগ্রতা নেই, সে কথা শোনাবার জন্য তুমি কেন কুণ্ঠিত হচ্চ। তুমি যদি জীবনে কোনদিন কোন অন্যায় করে থাক, কোন ভুল করে থাক আমি নিশ্চয় জানি তুমি কোন অন্যায় কিংবা কোন পাপকে কোনরূপেই গ্রহণ করনি, করতে পার না, তবু যদি তা হ'য়ে থাকে সেকথা বলে তুমি আমাকে কোন বেদনা দিওনা।'

বিজয় কহিল—'লীলা আর পারি না, আর অসংযত হৃদয়কে নিয়ে ছুটাছুটি কর্ত্তে পারি না। যে কথা এতদিন তোমাকে বলিনি, যে কথা

তোমাকে বল্‌তে আমি সঙ্কুচিত হয়েছি, আজ আমার সেকথা তোমাকে শুন্‌তেই হ'বে।" সাগ্রহে পরম আকুলতার সহিত লীলার হাত দু'খানি জোরে চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় কহিল—"তুমি আমাকে আশ্রয় দাও, তুমি আমাকে গ্রহণ কর লীলা, এই আমার শেষ নিবেদন।"

লীলা কোন মতেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, তাহার হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন ধ্বনি সে নিজেই শুনিতে পাইতেছিল, একটা রোমাঞ্চ একটা শিহরণ—একটা পুলক চাঞ্চল্য তাহার সারা দেহের উপর দিয়া বহিয়া গেল। নয়ন সমক্ষে শত বসন্তের আকুল আবেগ জাগাইয়া তুলিয়া দিয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়া দিল। লীলা কাঁপিতেছিল, তাহার ওষ্ঠাধর ব্যাকুল আগ্রহে কি দু'টী কথা বলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল। বিজয় তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিতেই সে তাহার মুখখানি বিজয়ের বুকের মধ্যে লুকাইল, বিজয় আদরে তাহার চিবুকটি ধরিয়া মুখখানি উঁচু করিয়া কহিল—"বল লীলা, বল বল! আমি আর যে পারি না বল আমার অনুরোধ রাখবে।" লীলা হাসিয়া কহিল "বিজয়! কোন্ অধিকারে তুমি আমায় লজ্জা দিচ্ছ। তুমি কি জাননা—আমি তোমাকে ভালবাসি কি না, যে জীবন একদিন তুমিই রক্ষা করেছিলে, সেই জীবন—সেই দেহ তোমারি! তুমি আমার ন্যায় সামান্য নারীর জন্য ব্যাকুল হয়েছ, এয়ে আমারি গৌরবের কথা। চল বাবাকে গিয়ে প্রণাম করে আসি।"

বিজয় ভুলিয়া গেল যে সে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, আর লীলা ভুলিয়া গেল সে ব্রাহ্ম। এইরূপ বাধা

যে কোনরূপেই দুইটী মিলনাকাঙ্ক্ষী নর নারীর মিলনের অন্তরায় হইতে পারে না তাহা সমাজে কতবার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। বিজয় ব্রাহ্মণ কন্যা লীলাকে ব্রাহ্ম হইলেও কোনরূপেই গ্রহণ করিতে বাধা মনে করে নাই। লীলার কাছে সমাজ, ধর্ম্মের কোন বিচার ছিল না, সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে যে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে তাহার জন্য সব করিতে প্রস্তুত ছিল

বরদাবাবু বেড়াইয়া আসিয়া নীচের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এইরূপ সময়ে বিজয় ও লীলা দুইজনে একসঙ্গে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি কহিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও, জগতের কল্যাণ কর। বিজয় আমার বড় গৌরব যে তোমাকে আমি আমার অতি আপনার জন রূপে গ্রহণ করতে পারবো।"

বিজয় ও লীলা কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহারা দুইজনে লজ্জানত শিরে উপরে চলিয়া গেল।

বরদাবাবু উভয়ের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইহাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী। তাই এইরূপ আকস্মিক আগমনে কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই।

তাঁহার এখন প্রধান চিন্তা হইল, বিবাহটা কোথায় কি ভাবে সম্পন্ন হইবে। কোন্ মত যে এইক্ষেত্রে প্রবল হইবে সেটাও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

পঁয়ত্রিশ

নায়েব শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীর অসাধ্য কোন কাজ ছিল না। সেজন্য রাধাকান্ত বাবু শ্যামাচরণের উপর নন্দনপুরে কমলার বাস উপযোগী অট্টালিকা পথঘাট ও পুষ্করিণী খননের ভার অর্পণ করিলেন। শ্যামাচরণ অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে জাঁকিয়া বসিয়া কার্য্য সুরু করিয়া দিল। গ্রামবাসী বিস্মিত হইয়া দেখিল—ন্যায় পঞ্চাননের পরিত্যক্ত ভিটার পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণ ইট, শুরকি আর পুকুরের চারিপার্শ্বের জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া তাহার খননের ব্যবস্থা হইতেছে। রামতনু বৃদ্ধ হইলেও যখন শুনিতে পাইল যে তাঁহার বড় সাধের দাদাবাবু সস্ত্রীক দেশে বাস করিবার জন্য এই আয়োজনে প্রবৃত্ত, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, সে প্রাণপণ আগ্রহের সহিত শ্যামাচরণকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাচরণের উপর আদেশ ছিল যে একথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়। কাজেই কে বা কাহার ব্যয়ে এই সকল কার্য্য হইতেছে সেকথা যখনই গ্রামের কেহ জানিতে চাহিয়াছে তখন শ্যামাচরণ বাবু উত্তর দিয়াছেন যে বিজয় বাবুর অর্থ ব্যয়েই এই সব হইতেছে।

অসাধারণ উদ্যোগী শ্যামাচরণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ন্যায় পঞ্চাননের পরিত্যক্ত ভিটার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। সুদৃশ্য অট্টালিকা, সুন্দর সরোবর, ফুলের বাগান সকলি যেন আলা-দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত গড়িয়া উঠিল! গ্রামের জনহিতকর

কার্য্যে গ্রামবাসী যে কোন ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে তাহাকেই শ্যামাচরণ বাবু মনিবের নির্দ্দেশ মত বিজয়ের নাম লিখাইয়া চাঁদা দিয়া আসিয়াছে। কাজেই বিজয় কবে বধূ লইয়া গ্রামে আসিবে সে আনন্দ উৎসবের শুভদিনের প্রতীক্ষায় গ্রামবাসী উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সব কাজ শেষ করিয়া শ্যামাচরণ চলিয়া গেল—গ্রামবাসী জনগণের সাগ্রহ প্রশ্নে বিজয় কবে গ্রামে ফিরিয়া আসিবে তাহার কোনও সঠিক উত্তর প্রদান করিতে পারিল না।

রাধাকান্ত বাবুর সব বন্দোবস্ত ঠিক হইলে ব্রজবাবুকে পত্র লিখিয়া জানিলেন যে বিজয় তথনও পুরীতেই আছে। এইবার কি করা যাইতে পারে তাহাই যে প্রধানতম সমস্যা। কোন্ পথে কি ভাবে এখন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে তাহা লইয়াই একটা মুস্কিল বাধিয়া গেল। কমলা কহিল 'বাবা, আমি তোমায় একদিনই বলেছি তোমার আজ্ঞা হেলা করবো না, তুমি আমায় কি করতে হবে বল। আমার ত তাঁর উপর এমন কোন অধিকার নেই যে আমি নন্দনপুরে গেলেই সেখানে আস্‌বেন।" তবু আমি সেখানেই যাব। সে কথা ঠিক্ এক্ষেত্রে ব্রজবাবুর অভিপ্রায় কি সেটা পুনরায় না জেনে কোন কাজই করবো না কমল!"

তাহাদিগকে এ বিষয়ের জন্য বিশেষ চিন্তা করিতে হইল না—ঠিক্ সে দিনকার ডাকে রাধাকান্ত বাবু ব্রজবাবুর এক পত্র পাইলেন 'তাহাতে তিনি রাধাকান্ত বাবুর এইরূপ তৎপরতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া লিখিয়াছেন যে তাহাদের মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া

গিয়াছে। শচীন্ ও প্রীতিবালা পুরী যাইতেছেন, ব্রজবাবু কোনরূপেই তাঁহার পুত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া পুরী আসিতেছেন এ সময়ে রাধাকান্তবাবু তথায় গেলে ভাল হয়। এই চিঠিতে তাহাদের সব মীমাংসা হইয়া গেল। যে ভাবনার কোন মীমাংসা তাহারা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল এত সহজে তাহার একটা সুগম পথ পাইয়া রাধাকান্তবাবু কহিলেন—"তবে মা কমল পুরী চল।"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর কণ্ঠে কমলা কহিল "বাবা! আমি কি এমনি তোমার গলগ্রহ হ'য়ে পড়েছি যে তুমি আমায় কোন মতেই দূর করে না দিয়ে ছাড়্‌বে না! আমি আর পুরী যাব না, আমাকে নন্দনপুর পাঠিয়ে দাও, আমি সেখানেই যাব; আর আমার কোন মান অপমান নেই।"

"তবে তাই হ'ক মা। তোমার সংকল্পই পূর্ণ হউক।"

রাধাকান্তবাবু কমলার অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহাকে নন্দনপুরে পাঠাইয়া দিয়া নিজে পুরী চলিয়া গেলেন।

ছত্রিশ

বরদা বাবু লীলাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ফাল্গুনের প্রথমভাগেই বিবাহ হয়। বিজয়ের মতানুযায়ী বিবাহ হিন্দু মতে হওয়াই স্থির হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া তিনি, বিজয় কিংবা লীলার মতের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন।

তাহাদের চলিয়া যাওয়ার পর বিজয় পুনরায় জব্বলপুর যাওয়া

স্থির করিয়া ষ্টেসনের প্লাটফরমে বেড়াইতেছে, তাহাদের গাড়ী ছাড়িবার তখনও অনেক বাকী। এরূপ সময়ে আর একখানা গাড়ী খুরদা জংসন হইতে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইল যে ব্রজ বাবু একখানা প্রথম শ্রেণীর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন, পাছে ব্রজ বাবু তাহাকে দেখিতে পান এবং তাহার যাত্রা-পথের বাধা পড়ে সেজন্য বিজয় অপর দিকে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই দেখিতে পাইল যে পশ্চাৎ হইতে ব্রজ বাবু তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। এরূপ অবস্থায় নিজকে গোপন করা যে কোনরূপেই চলিতে পারে না। ব্রজ বাবু দ্রুত আসিয়া বিজয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল "কোথায় পালাচ্ছিলে হে? তুমিত আচ্ছা লোক? এখন আর পালাতে হচ্চে না।' বিজয় তাঁহার পদধূলি শিরে লইয়া কহিল 'আপনি এরূপ হঠাৎ এখানে এলেন কি মনে করে?' ইতি মধ্যে শচীন ও তাহার পত্নী প্রীতিবালাও সেইখানে উপস্থিত হইল। শচীন্ হাসিয়া কহিল 'এইবার ধরা দেওয়ার পালা, আর কোথায় পালাবে বল।' বিজয় দৃঢ় স্বরে কহিল—'তা হ'লে এখন আসি ব্রজ বাবু—আমাদের গাড়ী ছাড়বার যে সময় হলো।" ব্রজ বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন—"বটে! আর কোথাও যেতে হবে না, মোকদ্দমার জঞ্জাল মিটে গেছে। দিন কয়েকের জন্য এখানে বেড়াতে এসেছি, তুমি এখান থেকে চলে গেলে যে সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে।'

প্রীতিবালা রহস্য করিয়া কহিল—'পালালে চলবে কেন? জানেনত এ ধরণীতে ধরা না দিয়ে কারু পালাবার জো নেই।"

শেষটায় বিজয় নিরুপায় হইয়া আত্ম সমর্পণ করিল। রাধাকান্ত বাবু বাহিরের বারেন্দায় দাঁড়াইয়া ইহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শচীন, প্রীতিবালা ও ব্রজবাবুর সহিত বিজয়কে দেখিতে পাইয়া তিনি কোনরূপেই আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, একেবারে নীচে ছুটিয়া যাইয়া বিজয়কে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিলেন—"বাবা! আমায় ক্ষমা কর। একদিন আমি গর্ব্ব করে বলেছিলাম, তুমি আমার নিকট দীন দরিদ্রের বেশে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা না চাইলে ক্ষমা করবো না, কিন্তু আজ তারি বিনিময়ে তোমারই নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি—আমায় ক্ষমা কর।"

বিজয় তাঁহার আলিঙ্গন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রণাম করিয়া কহিল—"আপনার অপরাধের আলোচনা করবার শক্তি আমার নেই; আমি দরিদ্র দরিদ্রই আছি আপনি আমাকে ক্ষমার কথা বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন। আপনি আমার গুরুজন, আমার ব্যবহার বা আচরণে যদি আপনি কোনরূপ দুঃখিত হয়ে থাকেন আমাকে মার্জ্জনা করবেন।"

বিজয়ের কাছে কোনরূপেই এই মিলন প্রীতিপ্রদ বা আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। মানুষ যাহা চায় না অনেক সময়েই তাহা মিলিয়া যায়। বিজয় কহিল—'আমি তবে এখন যেতে পারি বোধ হয়।' শচীন কহিল "সে, কি? বাবা কিংবা আমার ভগ্নির যে অপরাধ হয়েছে সে অপরাধের জন্য আজ আপনার নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থী, কোন মতেই আপনাকে এখান থেকে ছেড়ে দিচ্ছি না।"

ব্রজ বাবু কহিলেন—"বিজয়! কোন দিন আমি তোমাকে

কোন বিষয়ের অনুরোধ করিনি, কিন্তু আজ করবো, যে দু'দিন আমি পুরী থাক্‌বো সে কয়েকটা দিন কোন রকমেই এবাড়ী ছেড়ে যেতে পারবে না। আমি বল্‌ছি আমার এ অনুরোধ তোমার রক্ষা করতেই হবে।'

ব্রজবাবুর প্রতি বিজয়ের এত বড় শ্রদ্ধা ছিল যে সে কোনরূপেই তাঁহার একথার উত্তরে 'না' বলিতে পারিল না। এইবার যে তাহার জীবনে কত বড় ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত, সে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িল।

ব্রজ বাবু বিজয়কে কহিলেন—"দেখ বিজয়, মানুষের ভুল অনেক সময়েই হ'য়ে থাকে। একদিন রাধাকান্ত বাবু ও কমলা যে ভুলের জন্য তোমার নিকট অপরাধী, আজ কড়ায় গণ্ডায় সংশোধনের জন্য তাঁরা ব্যস্ত। এখন আর তোমার অভিমান বা উপেক্ষা কোনরূপেই গ্রাহ্য হ'তে পারে না।"

বিজয় কহিল—"আমি কোন দিন কারু কোন অন্যায়কে হৃদয়ে স্থান দিই নাই, আমার অপমানকে আমি অতি তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে করি। কিন্তু আমার বাবার অপমানের ক্ষমা ত আমি কোন রূপেই করতে পারি না।"

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন—"বিজয় শোন, কমল মা আমার কোন দোষে দোষী নয়, আমি পিতা হয়ে নিজের অভিমান বশে তার সর্ব্বনাশ করেছি। আমি নিজ আত্মম্ভরিতা দোষে তোমার বাবার মান মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছি। কমলার সরল বালিকা হৃদয়ের উপর বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়া দিয়েছি। তুমি ক্ষুণ্ণ হ'য়োনা—তুমি

প্রসন্ন চিত্তে কমলাকে গ্রহণ কর। কমলা আর আমার সে অভিমানিনী কমলা নেই এখন সে অহঙ্কার, অভিমান সব বিসর্জ্জন দিয়েছে।'

ব্রজ বাবু কহিলেন 'কমলা এখন কোথায় আছে?'

রাধাকান্ত বাবু কহিলেন—'নন্দনপুরে বিজয়ের বাড়ীতে আছে। সে তার শ্বশুরের বাক্য পালন কর্‌বার জন্য সেখানে চলে গেছে।'

বিজয় অবাক্ বিস্ময়ে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—'সে কি?'

প্রীতিবালা কহিল—'হ্যাঁ তাই—বিজয় বাবু, আপনি যদি একজন নারীর জীবন রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন কর্‌তেও কুণ্ঠিত না হ'ন তা হলে সে আপনার পত্নী হয়ে কি তার শ্বশুরের আজ্ঞা পালন করতে কুণ্ঠিত হবে? "যাক্ এখন চলুন বাড়ী যাওয়া যাক।" সকলে বিজয়ের বাসাতেই যাইয়া উঠিলেন। বিজয়ের আর পুরীত্যাগ করা হইল না।

বিজয় দেখিল দীর্ঘ অজ্ঞাত-বাসে তাহার যে সকল কথা সাধারণের গোচর হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, সে সকলই এই পরিবারের সকলের পরিজ্ঞাত। তাহার নিকট মস্ত বড় একটা প্রহেলিকার আবির্ভাব হইল, একদিকে বিবাহিতা পত্নী আজ সে পুড়িয়া থাক্ হইয়া তাহারি আশ্রয়প্রার্থিনী, অপর দিকে আর একজন রমণীকে সে বিবাহ করিবার অঙ্গীকারে বদ্ধ। সে কি করিবে? সে জীবনে কোন দিন কোন ভুল করে নাই, কিন্তু লীলাকে পাইবার আকাঙ্খা তাহার প্রাণে এমনি প্রবলতর হইয়াছিল যে সে কোনরূপেই আত্মগোপন না করিয়া বলিবার জন্য উন্মুখ হইয়াও বলে নাই—লীলাও শুনিতে চাহে

নাই। এইবার ত আর না বলিলে চলে না। না—না জীবনের সব কথা খোলসা করিয়া বলাই ভাল। সে যখন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, সে সময়ে পিওন একরাশ পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। বিজয়ের নামে ও সম্পূর্ণ অপরিচিত নারী অক্ষরে একখানা পত্র ছিল। সে চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া রাখিল।

প্রীতিবালা এখানে পঁহুছিয়াই কমলার নিকট এক পত্র দিয়াছিল তাহাতে কোন গোপন ছিল না। রাধাকান্ত বাবুর, প্রীতিবালার সকলের নামেই কয়েকখানা পত্র ছিল।

সাঁইত্রিশ।

কমলা নন্দনপুর হইতে বিজয়ের নিকট চিঠি লিখিয়াছিল। একদিন যে চিঠির জন্য বিজয় মেসের বাসার উৎকর্ণ হইয়া থাকিত আজ তাহা অনাকাঙ্খিতরূপে উপস্থিত হইয়াছে, সে চিঠিতে বিশেষ কিছুই ছিল না—শুধু একবার বিজয়ের দর্শন লাভের ইচ্ছা। পত্রখানা লিখিতে যাইয়া লেখিকার যে অশ্রু জলের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল পত্রে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। বিজয় সেদিনই পত্রের উত্তর দিল—সুধু দু'টী কথায়, তাহার কামনা পূর্ণ হইবে।

প্রীতিবালাকে কমলা লিখিয়াছিল—তাহার স্বাস্থ্য দিন দিন ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। তাহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ-একবার তাহাকে নন্দনপুর আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। রাধাকান্তবাবুর নিকট

অনেক কাজই ছিল। একদিন প্রীতিবালা কহিল—"বিজয়বাবু চলুন না একবার আপনাদের দেশটা বেড়িয়ে আসি।"

বিজয় কহিল—"বৌদি এমন দিন ছিল যে একদিন আপনাদের এই ব্যথায় আমার চিত্ত আনন্দে অভিষিক্ত হত, কিন্তু এখন আমার লজ্জার জ্বালায় হৃদয়ে বেদনা বোধ হচ্চে। এ যেন কতকটা চোরের মত যাওয়া। আজ যদি বাবা থাকতেন তাহ'লে আমাদের দরিদ্র-কুটীরে যে স্নেহের অভ্যর্থনা পেতেন এখন সে আশা অসম্ভব। আমিও আজ অতিথির মত দেশে যাব।"

প্রীতি কহিল—"আর কেন পেছনে তাকাচ্ছেন, চিঠি লিখেছেন, তাঁর স্মৃতিপূজাই আমাদের পরম লাভ। আপনি কোন কুণ্ঠা বোধ করবেন না বিজয় বাবু।"

"কুণ্ঠা বোধ করবো না, একথা আপনি বলেও যে আমার মনে কোন রকমেই প্রবোধ মানবে না। আপনি জানেন না আমার জীবনে কত বড় আঘাত ও কত বড় ঝঞ্ঝার পীড়ন আমি প্রতি নিয়ত সহ্য করে আসছি।"

"আপনার হাজার বেদনা হ'লেও আপনি পুরুষ সহ্য করবার শক্তি আছে। পুরুষ ও নারীতে যে কত বড় প্রভেদ সে কথা পুরুষ আপনারা কোন মতেই স্বীকার করতে চান না। আর কমলা শত অন্যায়, শত অপরাধ করলেও সে রমণী, সে আপনারই বিবাহিতা পত্নী। পুনরায় কহিল—"আজ আপনি সংসারে সুপ্রতিষ্ঠ, বিধাতা আপনাকে অজস্রভাবে অর্থ, সম্ভ্রমও মান সমর্পন করেছেন; এ সময়ে যদি আপনার ধর্ম্ম-পত্নীকে অবহেলা করেন, একদিনের অন্যায়কেই

চিরদিনের জন্য প্রকাণ্ড অন্তরায় রূপে গ্রহণ করে ব্যথিতা আশ্রয় প্রার্থিনী রমনীকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন তাহ'লে সেটাও কি ন্যায়ের বিধানে ন্যায্য বলে গৃহীত হ'বে! আমি যুক্তি তর্ক জানি না, আমি শুধু ন্যায়ের বিধান ও ধর্ম্মের বিধানকেই সকলের চেয়ে বড় বলে মনে করি।"

বিজয় কহিল—"আপনি আমাকে যে জন্য অপরাধী বল্‌তে চান সে অপরাধে আমি কখনও অপরাধী নই, ন্যায়ের কাছে ধর্ম্মের কাছে আমাকে কোনরূপেই দোষী কর্‌তে পারবেন না। আমি—বাবার মৃত্যু-শয্যায় বসেও কমলাকে যে ভাষায় পত্র লিখেছিলুম—যদি আপনি তা দেখে থাকেন ব'লে নিশ্চিত জানেন যে সে পত্রের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে আমার হৃদয়ের কত বড় ব্যথা প্রস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। এক-দিকে পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য, অপর দিকে পিতার শ্রদ্ধা ও অভিমানের সম্মান রক্ষা, আমি দুইদিক বজায় রাখ্‌তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কই কোন ফলত পাই নাই,—সে সময়ে কমলা যদি আমাকে দু'টী লাইনও লিখে জানাত তাহলেও হয় আমার ত স্বান্তনা ছিল!"

"সব মেনে নিচ্ছি বিজয়বাবু, সেজন্যেই ত আপনাকে বলেছি পুরুষ ও নারীতে অনেক তফাৎ। পুরুষের পক্ষে তাহাই অগৌরবের কারণ হয়। আপনি আপনার এই দৃঢ়তার জন্য জন সমাজের কাছে সন্মানিত, আর এই কারণেই কমলা লজ্জায় ম্রিয়মানা কুণ্ঠিত। অতীতের কথা আর তুলে কোন কোন ফল হবে না। তারপর বাবার কথা মনে করুন, তাঁর ন্যায় গর্ব্বিত আত্মভিমানী ব্যক্তির সমুদয় গর্ব্ব কে হরণ কচ্ছে? স্নেহ নয় কি? আপনার ও কমলার প্রতি যে

স্নেহ তাই সকলের উপরে মাথার মণি হয়ে আজ সব ভুলকে কি চরণে দলিত কচ্চে না? বলুন একথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন কি?"

'না কখনও না। কিন্তু আমার পথেও শুধু এই কথা বলবার আছে যে—একজন অন্যায় করলে কি দশজনের সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান উচিত নয়? আপনি কিংবা শচীনবাবুও ত একদিনের জন্য আমার সম্বন্ধে কোন সন্ধান নেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই?"

বিজয়ের এই শেষটুকু প্রীতিবালাকে সত্য সত্যই তীক্ষ্ণ তীরের মত আঘাত করিল।

সে খানিক চিন্তা করিয়া কহিল—এবার কোন প্রতিবাদ করবো না। করবার মুখ নাই। তবে এও নিশ্চয় জানবেন আমি অকপটে বলছি আমরা এ অন্যায়কে কোনদিন, যতদিন এ পরিবারে এসেছি সমর্থন করি নাই, মিঃ চৌধুরীও করেন নাই। তবে তেমন ভাবে যে সে অন্যায়ের সংশোধন করবার জন্য অগ্রসর হয়েছি তা'ও নয়। আমি অন্যায়ের বা মিথ্যার সমর্থন কোনদিন কোন কালে করি নাই, আজও করবো না।"

"তাহলে একথা না মেনে পারবেন না যে আমার অপরাধ বড় বেশী নেই?"

প্রীতিবালা দেখিল এইরূপ সঙ্কট সময়ে কোনরূপেই অযথা তর্কের জালে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দোষী বা নির্দ্দোষী সে কথা লইয়া গোলযোগ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। আর এখন তাহাদের যে হার স্বানিবারই পালা। কাজেই সে কথার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া

দিবার জন্য কহিল,—"সব মেনে নিচ্ছি বিজয়বাবু, এখন আর অতীতের কথা তুলে নিয়ে বাক্‌যুদ্ধে কোন লাভ নেই, দেখ্‌বো যেখানে তর্কের মূল্য আছে সেখানে তার সঙ্গে কতটা পেরে উঠেন। যাক্‌ ভাল কথা এখান থেকে আপনাদের ওখানে যেতে কতদিন লাগবে ?"

বিজয় এই শিক্ষিতা রমণীর যুক্তি পূর্ণ তর্কের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বিজয় লাভ করায় একটু আত্মপ্রসাদ যে লাভ করিয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সে কহিল,—"খুব দূর নয় বৌ'দি, তিন দিনের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছিব। তা আমি বাড়ীতে রামতনুকে একখানা চিঠি লিখে দিই, সে আজ এতকাল পরে আমার চিঠি পেয়ে কি মনে করবে জানি না, আর সেই বুড়ো বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে ?"

প্রীতিবালা হাসিয়া কহিল—"দেশের বুঝি কোন খোঁজই রাখ্‌তেন না বিজয়বাবু ?"

'না—সে দিকে আর কোন লক্ষ্যই করিনি।'

"কেন ভয়ে নাকি ? পাছে আমরা খোজ খবর পাই ?"

বিজয় কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া কহিল—'আর না বৌ'দি, দোষ গুণের দেনা পাওনা ত শোধ হইয়াই গেছে, আবার যদি ও কথা তুলতে যান, তা হ'লে যে তর্কের নীতিতে মস্ত বড় অন্যায় করা হয়।"

প্রীতিবালা প্রসন্নমুখে হাসিয়া কহিল,—"নিশ্চয় ক্ষমা করবেন, হাজার হলেও আমরা মেয়ে মানুষ ত বটে।"

"এ কথা কি আজকাল আর আপনাদের মনে থাকে?"

"আমাদের খুবই থাকে, কিন্তু মশাইদের যে বড় একটা থাকে তা একেবারেই সত্যি নয়।"

আটত্রিশ

এই কি সেই কমলা? ধনীর দুহিতা রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা অভিমানিনী জমিদার কন্যা? কে বলিবে এই কমলা গর্ব্বিতা ও ধনগৌরবিনী। কমলা যে দিন নন্দনপুরে আসিয়া পৌঁছিল, সেদিন নদীর ঘাটে গ্রামের ঝি বৌ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকই যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। একখানা বজরাতে করিয়া বিশেষ কোনও জাঁকজমক ছাড়া কমলা দাস দাসী পরিবৃত হইয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। সকলে দেখিল ক্ষীণাঙ্গী এক রূপ-লাবণ্যবতী রমণী অতি সাধারণ বেশ ভূষায় সজ্জিতা পাল্কীতে আরোহণ করিল। কমলার সঙ্গে শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী আসিয়াছিলেন।

দুশ্চিন্তায়—অনুতাপে কমলার প্রাণ অহর্নিশি জ্বলিতেছিল। সে কোন্‌মুখে পতির সমক্ষে উপস্থিত হইবে? কোন্ ভাষায় সে পতিকে সম্ভাষণ করিবে—কলুষিত দেহ ও মন লইয়া কি দেবতার সেবা চলে? অতিরিক্ত পরিশ্রমে নানা দুশ্চিন্তায় তাহার শরীর ও মন রোগের তীব্র দাহতে পুড়িয়া গিয়াছিল। গ্রাম্য নরনারীর সরল অমায়িকতা পূর্ণ ব্যবহারে তাহার মনে হইত কি কুহকে সে আচ্ছন্ন হইয়া জীবনকে এমন ব্যর্থতার মাঝখানে সে ছাড়িয়া

দিয়াছিল। খোলা মাঠের ধারে সুন্দর বাড়ী, অদূরে নির্ম্মল পুণ্য সলিলা নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

কমলা সর্ব্বদা খোলা জানালার পথে সে দৃশ্য দেখিত। নীরবে সে সেইদিকে চাহিয়া থাকিত তাহার আর নয়ন ফিরিতে চাহিত না, মন কোথায় কোন্ অদৃশ্য পথে, কোন্ অদৃশ্য লোকে উড়িয়া পলাইত সে পথের সন্ধান সে পাইত না। দুপুর বেলা পল্লীরমণীরা নিজেদের গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়া তাহার নিকট সমবেত হইত। কমলা তাহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত, এই সময় টুকু কেমন করিয়া কখন যে কাটিয়া যাইত সে দিকে সে কোন লক্ষ্যই রাখিতে পারিত না।

ইদানীং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার জ্বর হইতে আরম্ভ করিল। সে তাহার এই অসুখের কথা পিতাকে জানায় নাই। রামতনু কমলার এখানে আসার পর হইতে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার করিয়া আসিয়া তাহাকে 'মা মা' সম্বোধনে আহ্বান করিত। কমলা এই বৃদ্ধের সরল ব্যবহারে অশ্রু বেগ সম্বরণ করিতে পারিত না, একদিন রামতনু কহিল—"মা, তুমি যে দিন দিন বড় রোগা হয়ে যাচ্ছ?—আহা! শরীরের দিকে একটু লক্ষ্য রেখ, বড়মানুষের মেয়ে তুমি, তোমার কি কোন কষ্ট সহ্য হয়? আমার কথা শোন মা! আজ যদি ন্যায়পঞ্চানন কাকা বেঁচে থাকতেন, তবে কি আনন্দেরই না হ'ত।" শ্যামাচরণবাবু কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি সাধ্যানুযায়ী কমলার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সবকথা রাধাকান্তবাবুকে খোলসা করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের

আসাটা যে এখন কত বড় প্রয়োজন, পত্রে সে কথার বিশেষ করিয়া উল্লেখ ছিল।

কমলা সেদিন চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে। পল্লীবধূরা বেলা অবসানেই যার যার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে একরাশ ডাকের চিঠিসহ দাসী আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। পুরী হইতে রাধাকান্তবাবু, প্রীতিবালা, শচীন সকলেই তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে। বিজয়ের চিঠিও এই সঙ্গে ছিল। সকল চিঠি একদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কমলা কম্পিত হস্তে বিজয়ের চিঠিখানা খুলিল। বিজয় মাত্র দুইটী লাইন লিখিয়াছে, তাহাতে কোনও প্রীতি সম্বোধন ছিল না, কোনও অতিরিক্ত কথা ছিল না—শুধু দুইটী ক্ষুদ্র লাইন,—"কমলা! তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।" বিজয়।

কমলা চিঠিখানা মাথায় ছোয়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"এই আমার সর্ব্বস্ব! এই আমার মাথার মণি—আমার পরম বস্তু।"

রাধাকান্তবাবু তাহার পীড়ার সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা দুই চারি দিনের মধ্যেই বিজয়ের সহিত নন্দনপুরে আসিতেছেন। শ্যামাচরণকে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে লিখিয়াছেন। কমলা তাহার শত দুঃখ বেদনার ভিতরেও বিজয়কে পাইবার আশায় আনন্দে নবীন উৎসাহ ও উদ্যম অনুভব করিতেছিল। ক্রমে দিন ঘনাইয়া আসিল। সকলে কাল আসিয়া পঁহুছিবে, কমলা এ কয়েকটা দিন প্রাণপণ করিয়া খাটিয়া সমুদয় দিকে তত্ত্বাবধান করিয়াছে, যে দিন রাধাকান্তবাবু প্রভৃতি সকলে আসিয়া পঁহুছিলেন, সেদিন কমলা শয্যাশায়িনী হইল। তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিল

না। তবু সে উষা সমাগমে উৎফুল্লমুখী কমলের ন্যায় জানালায় গরাদ ধরিয়া বসিয়া সকলের আগমনের দিকে চাহিয়াছিল। বিজয়ের দৃষ্টি হঠাৎ সে দিকে পড়ায়—ছায়ার মত সে সরিয়া যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ঊনচল্লিশ

রাধাকান্তবাবু কমলার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া কহিলেন,—"কমল এমন করেই কি বুড়ো ছেলেকে ফাঁকি দিতে হয় মা?"

"কেন বাবা?"

"কেন! কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে একবার বুঝ্‌তে পাচ্ছ কি? কেন আমাকে গোপন করেছ? আমি কি তোমাকে হারাবার জন্য এখানে এসেছি?"

কমলা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল "কোন ভয় করোনা বাবা, আমি সেরে উঠবো।"

"তাই যেন হয় মা। আজই আমি কল্‌কাতা থেকে ডাক্তার আন্‌বার জন্য লোক পাঠাব। এমন করে কি প্রতিশোধ নিতে হয় মা?"

রাধাকান্তবাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল; অশ্রুর বন্যা ঝড়ের বেগের মত মুক্ত প্রবাহে তাহার গণ্ডদেশ ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। যে পত্নীকে তিনি জীবিতকালে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়াছেন, যাহার কোন কথাই তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন

নাই, আজ সেই পরলোকগতা পত্নীর প্রত্যেক কথা এ ভাবে সত্য হইতেছে দেখিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিতেছিলেন, সেই লক্ষ্মী স্বরূপিণী মহিলার সংসার সম্বন্ধে কত বড় দূর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা ছিল।

প্রীতি কমলার রোগশীর্ণ দেহ ও মলিন মুখশ্রী দেখিয়া কহিল—"কমল, বিরহে কি মানুষকে এমন করে তোলে নাকি?"

কমলা কহিল, "বৌ'দি! বিরহের আগুণেত কোন দিন জ্বলনি, তুমি আর বিরহের বেদনা কি বুঝবে?"

প্রীতিবালা কহিল—হাঁ হাঁ, সে বুঝবো এখন। কিন্তু কমল, বাস্তবিক তোর জন্য আমার বড় দুঃখ হয়, এমন ভাল মানুষটাকে যে কেন এতদিন কষ্ট দিয়েছ, সে ভাবলেও বড় লজ্জা বোধ হয়।"

"তোমারও দেখ্‌ছি বৌ'দি সেইদিকেই সহানুভূতি।"

"যাক্ এখন কথা ছাড়, অভিসার বেশে সজ্জিত হও। শ্যাম এসেছে লো।"

বাক্স খুলিয়া ভাল সাড়ি, জামা বাহির করিয়া চুল বাধিয়া দিয়া কহিল,—"একবার আর্শির কাছে গিয়ে দাঁড়া দেখি?" তারপর নিজেই চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিল—"এ রূপে জগৎ জয় হয়, আর বিজয়বাবু কোন ছার।"

কমলা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—"ছাইরূপ!"

চল্লিশ

বিজয় শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতে—কমলা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। বিজয় কোন কথা বলিল না—কমলার মুখ হইতে

ও কোন কথা বাহির হইতেছিল না। পালঙ্কের এক পাশে উপবেশন করিয়া সাগ্রহে কমলার হস্তাকর্ষণ করিয়া বিজয় তাহাকে বসাইয়া কহিল—"কমলা ?"

এই একটী মাত্র কমলা সম্বোধনে কমলার চিত্তে শত তরঙ্গ আলোড়ন করিতে লাগিল। সে কাঁপিতেছিল, তাহার রোগশীর্ণ দেহ এলাইয়া পড়িতেছিল। তাহার নিষ্প্রভ নয়ন কোনে একটা জ্যোতিঃ বিকাসিত হইতেছিল।

কমলার কত কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল—কিন্তু সেত বলিতে পারিতেছিল না। তাহার ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কম্পিত ও সারাদেহের উপর দিয়া যেন একটা অস্বাভাবিক লজ্জা ও অনুতাপের ঝড় হৃদয় চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দিয়া দ্রুতবেগে বহিতেছিল। বিজয় আবার ডাকিল—'কমলা' !

"কমলা সঙ্কোচে মাথা নীচু করিয়া কহিল 'কি ?" বিজয় ভাবিল এই কি সম্ভাষণ ? এতকাল পরে কি এই একটী কথায়ই সব শেষ হইয়া গেল ? আর কিছু কি তাহার বলিবার নাই। কতকাল পরে তাহাদের দুইজনের দেখা তবু উভয়ে বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরের হেনাফুলের ঝাড় হইতে একটা উগ্রগন্ধে কক্ষ মধ্যে একটা মাদকতা সৃষ্টি করিয়া দিতেছিল, ফাকা ফাকা মেঘের আড়াল হইতে জ্যোৎস্না ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। পাশের একটা সহকার তরুর শাখায় বসিয়া একটা কোকিল অবিরাম কুহুস্বরে ঘুমন্ত পল্লির নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। বিজয় কহিল—"কমলা, আমি যে তোমাকে দুঃখ দিয়াছি, সেজন্য আমি অনুতপ্ত, তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

কমলা অশ্রু বিগলিত নয়নে ভগ্ন কণ্ঠে কহিল—"তোমার অপরাধ ? এর চেয়ে আর আমার অপমানের কথা কি আছে ? আমি যে তোমার চরণ ধুলারও যোগ্য নই। তোমাকে আমি যে পরিমাণ আঘাত দিয়েছি, তাহার যে কোনও মার্জ্জনা নেই। তুমি দেবতা তাই আমাকে গ্রহণ করতে এসেছ কিন্তু আমি জানি আমি কোনমতেই তোমার গ্রহণের যোগ্য নই।" কমলার মনে হইতেছিল—এমন দেবতা যে স্বামী, তাহাকে সে ভুলিয়াছিল কোন্ মোহে ? এমন উদার এমন সুন্দর সুপুরুষ তাহার স্বামী—এযে কত বড় গর্ব্বের কথা ! বিজয় তাহাকে সবলে কোলের নিকট আকর্ষণ করিয়া কপোলদেশে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিতে উদ্যত হইবামাত্র কমলা তীরের মত বেগে তাহার আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার পা'দুটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ওগো ! তুমি আমায় আর লজ্জা দিও না, আমি যে কোনরূপেই তোমার যোগ্য নই, এই দেহ তোমার স্পর্শের যোগ্য নহে এতদিন যে আগুণের জ্বালা হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম, আজ যে সেকথা তোমাকে না বলে আমি কোন মতেই শান্তি পাচ্ছি না।" বিজয়ের সম্মুখে যেন একটা ভীষণ অজগর সর্প আসিয়া ফনা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেন একটা আগুণের তীব্র জ্বালা তাহার সারা দেহের উপর দিয়া জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। বিজয়ের মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইতেছিল না। সে বিস্মিত নেত্রে কমলের দিকে চাহিয়া রহিল। কমলার লাবণ্য শ্রী কোথায় চলিয়া গিয়াছে ? সেই চঞ্চল চপল বিদ্যুতের মত শুভ্র সুন্দর সরল হাস্য তাহার কোথায় ?

বিজয় তাহাকে সাদরে তুলিয়া পাশে বসাইয়া কহিল "কমলা! তুমি কোন অপরাধ করনি। তুমি স্থির হও। তুমি পিতার আজ্ঞা পালন করে যে অন্যায় করেছ, সে অন্যায়ের দোষ আমি গ্রহণ করতে পারি না। আর—

কমলা কহিল—"না না তোমায় শুনতে হবে, তোমায় না শুনিয়ে অন্তরের জ্বালা সইতে পারি না। তুমি শোন, তারপর আর আমি কিছু চাইব না,"—এই বলিয়া সে আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস—মিঃ মুখার্জ্জির প্রতি তাহার মনের চাঞ্চল্য, সব কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া কহিল—"এখনও কি তুমি আমায় মার্জ্জনা করতে পার?"

বিজয় চুপ করিয়া সব কথা শুনিল—তারপর ধীরে ধীরে কমলার মাথাটা নিজের বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া প্রশান্ত বদনে ধীব গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—"কমলা! ভুল মানুষেরই হয়, সে ভুলের মার্জ্জনাও মানুষেরই হাতে। তুমি যে ভুলের জন্য অনুতপ্ত ও দুঃখিত, আমিও তারচেয়ে কম ভুল করি নাই। শুনবে?"

কমলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল——"আমার সেকথা শোনবার কোন প্রয়োজন নেই, আর সে কথা শুনবারও অধিকারও নেই; তুমি—

বিজয় বাধা দিয়া কহিল, "কমল! সে হ'তে পারে না। পুরুষের ভুল ও নারীর ভুল—কোনটারই কম বেশী হ'তে পারে না।" তখন ধীরে ধীরে বিজয় লীলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ, তাহাকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার, তাহার সহিত প্রণয় ও বিবাহের প্রস্তাব পর্য্যন্ত সব কথা অকপটে কহিয়া গেল। সব কথা বলা হইলে—বিজয় পরম আদরের সহিত কমলার চিবুকটি ধরিয়া

কহিল, "কমলা! আমি তোমাকে পূর্ণভাবে মার্জ্জনা করলেম, আমাকেও তুমি ক্ষমা করো।" বিজয় এমনি করুণ কোমল বেদনা মাখান সুরে এই কথা কয়টি কহিল যে কমলার সারাদেহ কম্পিত করিয়া একটা সমবেদনা গুমরিয়া উঠিতেছিল।

সে বিজয়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কহিল—"আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

বিজয় কহিল,—"কি?"

কমলা ঝরাফুলের হাসির মত ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—"তুমি তাকে বিবাহ কর। কোন অন্যায় হবে না, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ, তুমি আমায় গ্রহণ করেছ, এর বেশী আর আমি কিছু চাই না।"

বিজয় চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে যে কত বড় একটা জীবন সমস্যা খেলিয়া বেড়াইতেছিল সে কথা যে কমলা না বুঝিতেছিল তাহা নহে। বিজয়কে নীরব থাকিতে দেখিয়া কমল কহিল,—"আমি যাহা পাব বলে মনে করি নি, সে জিনিষ আমি পেয়েছি, তোমার ক্ষমাই আমার পরম লাভ। আমি যে অমূল্য রত্ন আজ লাভ করেছি—সে জিনিষ আমার হৃদয়ের মাঝ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তুমি কেন কুণ্ঠীত হচ্চ?"

বিজয় কহিল, "লীলাকে আমি জানি, সে আমার এ অপরাধকে কথনও অন্যায় বলে মনে করবে না। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, আমি তোমাকে কখনও হেলা করতে পারি না; লীলা এজন্য আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।" হায়! পুরুষের মন কথন কোন্ দিকে

কি ভাবে যে গড়াইয়া পড়ে তাহা ত কেহই বলিতে পারে না। নিরপরাধিনী সরলা লীলাত কিছুই জানে না। সে মিলনের শুভদিনের প্রতীক্ষায় পরম আগ্রহে দিন গুনিতেছিল।

কমলা কহিল,—"সে কথ্‌খনো হ'তে পারে না। আমার এ ভাঙ্গা শরীর আর জোড়া লাগবে না। জীবনে তোমার কাছে এই আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ, তুমি আমার সেই অনুরোধ হেলা কর না। লীলাকে একবার যদি অসম্ভব না হয় এখানে আস্‌তে লেখ; আমি সেই ভাগ্যবতী নারীকে একবার দেখতে চাই। তুমি নিশ্চয় জেন, আমার শেষ দিন আর বড় বেশী দূরে নয়।"

বিজয় নীরবে কমলার সবগুলি কথা শুনিয়া কহিল, "এত বড় নিষ্ঠুর আমি নই, এত বড় অন্যায়কে আমি কোন মতেই প্রশ্রয় দিব না। আমি নিজে লীলার কাছে গিয়ে সব কথা বলবো। তার প্রতি যে আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের ক্ষমা চাইব।"

কমলা আর কোন কথা কহিল না। নীরবে বিজয়ের বুকে মাথা রাখিয়া অজস্র অশ্রু ধারার প্লাবনে তাহার বক্ষ ভাসাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "এখন আমি মরতে কোনও ভয় পাব না। আমি আজ তোমার দয়ায় পাপ মুক্ত—আজ আমার হৃদয়ের কোন অংশে কোন ক্ষোভ কোন দুঃখ নেই।"

বিজয়ের কোমল প্রাণ সত্য সত্যই গর্ব্বিতা কমলার এইরূপ পরিবর্ত্তনে দ্রবীভূত হইয়াছিল। সে কমলার জন্য চিন্তিত হইয়া

পড়িয়াছিল। বুদ্ধিমতী কমলা তাহার এই চিন্তার ভাব ও বিমর্ষতা উপলব্ধি করিয়াছিল। তাই সে পুনরায় করিল—"তোমার কাছে কোন দিন কিছু আব্দার কর্বার সুযোগ আমার হয় নি, আজ তুমি আমাকে সব দিয়েছ, শুধু শেসটুকু দিয়ে বিদায় দাও। তুমি লীলাকে আস্তে দেখ।" কমলা এইরূপ ভাবে বিজয়ের নিকট এই কথা কয়টি পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতে আরম্ভ করিল যে, বিচলিত চিত্তে বিজয় কহিল, "কমলা! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। বিধাতা যে ভুলভ্রম সূত্রে আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, জানি না কোথায় তার শেস। তোমার অনুরোধ আমি উপেক্ষা করবো না।"

একচল্লিশ

লীলার হিন্দুমতে বিজয়ের সহিত বিবাহ হইবে একথাটি যখন ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের কর্ণগোচর হইল তখন তাহারা একটা হুলস্থুল বাধাইয়া তুলিল। বরদাবাবুর সহিত এই লইয়া তাহাদের বিশেষ গোলযোগ বাধিল। এমন সময়ে লীলা বিজয়ের হইতে একখানা খুব বড় রকমের চিঠি পাইল।

বিজয়ের প্রতি লীলার এমনি আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল যে এই সুদীর্ঘ পত্রের নিষ্ঠুর মর্ম্ম অবগত হইয়াও তাহার প্রতি লীলার বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর উপস্থিত হইল না, বরং তাহার এইরূপ অকপট ব্যবহার, অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিল। লীলা পত্রখানা মনোযোগের সহিত পড়িয়া বরদাবাবুকে

কহিল "বাবা, বিজয়বাবু আমাকে যে পত্রখানা লিখেছেন এটা তোমার একবার পড়া দরকার।"

বরদাবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন "কেন? তার কি কোন মত বদ্‌লেছে নাকি?"

লীলা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "তাঁহার যা কিছু বল্‌বার এ চিঠিতেই আছে। তুমি একবার পড়ে দেখ বাবা।"

বরদাবাবু এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা শেষ করিয়া কহিলেন,—"এখন উপায়? এ কি রকম ব্যবহার; এরূপ প্রবঞ্চনা—

লীলা মাথা উঁচু করিয়া গ্রীবা হেলাইয়া সতেজে কহিল, "ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা, যে বিজয়বাবু আমাদের জন্য কতদূর করেছেন। যিনি নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যোগী হতে পারেন তিনি কি সাধারণের চেয়ে অনেক উপরে নন, তিনি আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত হ'য়েছিলেন, সে তাঁর মহত্ত্ব। আমি তাঁর প্রতি একটুও শ্রদ্ধাহীন হইনি, বরং শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে।"

বরদাবাবু অসহিষ্ণুভাবে কহিলেন,—"সবকথা মেনে নিচ্ছি লীলা, কিন্তু তাঁর কি পূর্ব্বেই উচিত ছিল না তোমাকে সব কথা জানান?"

"তিনি আমাকে বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি শুন্‌বার কোন প্রয়োজন মনে করিনি, আজ তিনি যে অবস্থায় পড়েছেন, এতে সহানুভূতি আসাই স্বাভাবিক, এতে বিরুদ্ধভাব কোনমতেই আস্‌তে পারে না।"

বরদাবাবু কহিলেন, "একদিকে সমাজের লোক ক্ষেপেছে, তার উপরে আবার একি গোলযোগ উপস্থিত হ'ল।"

লীলা হাসিয়া কহিল, "কিছুই গোলমাল নেই বাবা। আমি বিজয়বাবুর অনুরোধ রক্ষা করবো, তুমি আমার সঙ্গে চল।"

বরদাবাবু ধীরভাবে কহিলেন, "কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ মা, বিজয়ের স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনেরা কি ভাবে আমাদের গ্রহণ করবেন?"

"না বাবা! সে হ'তে পারবে না, আমি যাবই, নিজের সুখটাইত সংসারে বড় প্রবল নয়। একজন পীড়িতা নারী একবার আমায় দেখতে চাইছেন, তাকে দেখতে যাব না? এতে যদি সমাজে আমাকে নিন্দা করে, সে নিন্দা আমি মাথা পেতে নেব।"

বরদাবাবু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। সেদিন ট্রেনেই লীলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি নন্দনপুর রওনা হইলেন।

বিয়াল্লিশ।

লীলা ও বরদাবাবু যেদিন নন্দনপুরে পঁহুছিলেন, সেদিন কমলার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত প্রায়। বিজয় মাথার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে; রাধাকান্তবাবু কহিলেন,—"মা কমলা, খুব প্রতিশোধ নিলি মা! খুব শাস্তি দিয়ে যাচ্ছিস্।" এমন সময়ে লীলা আসিয়া রাধাকান্তবাবুকে প্রণাম করিলে—তিনি সাদরে লীলার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, মা তুমি সুখী হও।"

রাধাকান্তবাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। বিজয় লীলাকে দেখিতে পাইয়া কহিল,—"কমলা লীলা তোমায় দেখ্‌তে এসেছে।" কমলা ঈষৎ চক্ষু উন্মীলন করিয়া কহিল, "কোথায়?" লীলা নিকটে আসিয়া বসিয়া কহিল, "এই যে দিদি!" রুগ্নার ম্লান মুখে ঈষৎ হাস্য রেখা বিকশিত হইয়া উঠিল—সে মৃদু স্বরে কহিল "লীলা বোনটী আমার—যে জিনিষ কেউ কখনও হাতে করে দিতে পারে না, সে জিনিষ আমি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, আমি অমর্য্যাদা করেছি, আমি অনাদর করেছি, কিন্তু তুমি তা কর না। আমি যে পরশ-মণির স্পর্শে সোণা হয়েছি, তুমি সেই পরশমণি বক্ষে ধারণ করে চিরসুখিনী হও।"

লীলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কমলার কাতর কণ্ঠের বাণী শুনিল, তাহার হৃদয়ে [illegible] কে যেন এমন ভাবে আঘাত করিতেছিল, যাহার প্রভাবে সে তাহার নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল। কোথায় সে বসিয়াছে, কেন সে আসিয়াছে, সবই যেন একটা বিচিত্র স্বপ্নের মত প্রতিভাত হইতেছিল। লীলা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল,—"দিদি! তুমি আমাকে অত বড় স্বার্থপর—অত বড় হীন মনে করো না, এ কখনও হ'তে পাবে না, এ কখনও হবে না, তুমি যাঁর ধর্ম্মপত্নী একদিন যিনি তোমাকে ঈশ্বর সাক্ষী করে গ্রহণ করেছিলেন, তুমি তাঁরই এবং তিনি তোমাকে ছাড়া অন্য কোন রমণীকে গ্রহণ করে ধর্ম্মে পতিত হ'তে পারেন না। আমি কোন মতেই তা পারবো না—তুমি আরোগ্য লাভ কর—আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কচ্ছি তিনি তোমাকে রোগ মুক্ত করুন।"

বিজয় কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না, আজ তাহার বক্ষের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। এ কয়দিনে সে বুঝিতে পারিয়াছিল কমলার ভালবাসা কত প্রবল। কমলার হৃদয় কত বড় মহৎ, বিজয় কমলার চিকিৎসার জন্য কলিকাতা লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল— কমলা তদুত্তরে বলিয়াছিল "তুমি আমাকে এমন কথা বলিও না, আমি এখানে মরবো, এই আমার কাশী। তোমাকে তোমার পিতৃবাক্য কোন মতেই লঙ্ঘন করতে দিব না।"

লীলার কথা শুনিয়া কমলার মুখ প্রসন্ন শ্রীলাভ করিল, সে তাহার শীর্ণ হাত দু'খানি দিয়া লীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "লীলা! তুমি পুণ্যবতী, তোমার জীবন ব্যর্থ হয় এ আমার অভিপ্রায় নয়। আর আমি—আমিত চলেই যাচ্ছি। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও। আমি কোন [illegible] কষ্ট নিয়ে যাচ্ছি না। বল লীলা আমার কথা রাখবে?"

লীলা কোন কথা কহিল না। সে ধীরে ধীরে রুগ্নার শীর্ণ কোমল হাত দু'খানি নিজের সুকোমল হাতের মুঠির মধ্যে লইয়া পরম সমাদরে বুলাইয়া যাইতে লাগিল।

বিজয় কহিল—"লীলা! আমি তোমার কাছে গুরুতর অপরাধী তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

লীলা কহিল, "সেজন্য কোন গ্লানি মনে আনবেন না বিজয়বাবু; আমি শুধু আপনার কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি না, মহত্ত্বের কাছে শির নত কচ্ছি। এখন সে কথা থাক্।"

কমলা সংজ্ঞাহীনের মত পড়িয়াছিল, এইবার পুনরায় [illegible]

একটু সংজ্ঞালাভ করিয়া কহিল,—"লীলা, বোন্‌টী আমার, তুমি কি আমার এ অনুরোধ রাখ্‌বে না ? তোমার নিকট যে অপরাধের জন্ত ইনি দোষী, সে অপরাধের মার্জ্জনা আমায় দাও। আমি শান্তিতে মরি।"

লীলা কমলার পদধূলি মাথায় লইয়া কহিল, "দিদি ! তোমার অনুরোধ আমি কোন মতেই রক্ষা করতে পারবো না, তবে হ্যাঁ, আমিও তোমাকে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, যে পরশমণির স্পর্শে তুমি সুবর্ণ হয়েছ, সে পরশমণি আমিও যতদিন বাঁচবো, পরম আদরে বুকে রাখবো। প্রেমের পরশমণি মানুষকে দেবতা করে, মৃত্যুর ভিতর অমৃতের সন্ধান বলে দেয়, আমি সেই পরশমণি লাভ করেছি।"

কমলার আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। সে ইঙ্গিতে বিজয়কে নিকটে আসিতে অনুরোধ করিল, বিজয়ের পদধূলি ধীরে অতি ধীরে কম্পিত হস্তে মাথায় তুলিয়া লইল। বিজয়ের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, সে রুদ্ধ কণ্ঠে ভগ্নস্বরে ডাকিল, "কমলা !" তাহার এই বিকট চীৎকারে সকলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয় কমলার ললাটে আবেগভরে চুম্বন করিয়া নির্ণিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর—একবার শুধু কমলার শেষ ব্যাকুল দৃষ্টির সহিত বিজয়ের দুইটী সজল নয়নের মিলন হইল।"

সম্পূর্ণ।